আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা — পৃষ্ঠা ২
ফলতা বিশেষ শিল্পাঞ্চলের কথা — পৃষ্ঠা ৩
ফলতা এসইজেড–এ শ্রমিকের জোগান — পৃষ্ঠা ৫
ফলতা এসইজেড–এর ক্যাচড়া বৃত্তান্ত — পৃষ্ঠা ৬
শেনঝেন থেকে ফলতা
এসইজেড : তিন দশকের পরিক্রমা — পৃষ্ঠা ৭
জন–বিবেচনায় মহারাষ্ট্রের এসইজেড — পৃষ্ঠা ১০

সভ্যতা নিয়ে জন জের্জেনের
বিচারমূলক আলোচনা — পৃষ্ঠা ১১

আবহাওয়া পরিবর্তন ও
উপকূলের জনগোষ্ঠী — পৃষ্ঠা ১৪

পত্রিকা পর্যালোচনা :
আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও
সুন্দরবন অঞ্চলের এক পত্রিকা — পৃষ্ঠা ১৬

দান্তেওয়ারার আশপাশে — পৃষ্ঠা ১৭

চিঠিপত্র :
বিষয় : সমস্যা সমাধানে ‘মন্থন’ — পৃষ্ঠা ২২

তপনের সংসার — পৃষ্ঠা ২৩

নভেম্বর–ডিসেম্বর ২০০৯ ❑ দশম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ ৬ টাকা

মন্থন সাময়িকী

ফলতার পঁচিশ বছরের কীর্তি

অতীতে আমাদের দেশে মেলা ছিল মানুষের মেলবার জায়গা। যেমন ছিল হাট। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে হাট বসত। হাট এখন বসে না, বসানো হয়। মেলাও এখন লোক জড়ো করার একটা ফিকির। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মেলবার ইচ্ছের ওপর একটা কারসাজি। এমনকী পুরনো মেলাগুলোও এই কারসাজির ঠেলায় দূষিত হয়ে পড়েছে।

ফলতায় স্পেশাল ইকনমিক জোনের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন চলছে। এই উপলক্ষ্যেও জোনের কর্তৃপক্ষ সেখানে একটা মেলা বসিয়ে দিয়েছে। বড়ো বড়ো তোরণ তৈরি করা হয়েছে; ফলাও করে স্পেশাল ইকনমিক জোনের মহিমা কীর্তন চলছে। অথচ জোনের ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ ঠিকাশ্রমিক। এই হাজার হাজার ঠিকাশ্রমিক — বিশেষত মহিলারা — পঁচিশ বছর ধরে টের পেয়ে চলেছে জোনের মহিমা! জীবজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই বোধহয় নিজের স্বার্থবুদ্ধির দিকে তাকিয়ে এতখানি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং অন্য মানুষকে এইভাবে লাঞ্ছিত করতে পারে — যা চলছে ফলতায় কড়া পাহারায় জোন নামক ঘেরাটোপের আড়ালে।

এবারের সংখ্যায় আমরা ফলতার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চেয়েছি। চীনের স্পেশাল ইকনমিক জোন এবং সেখানকার শ্রমিকদের জীবন নিয়ে একটা চর্চা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে এভাবে একটা প্রক্রিয়া টানা পঁচিশ বছর ধরে চলতে পারল, তার সুনাম (বা দুর্নাম) কাদের প্রাপ্য? দিল্লি না রাজ্য সরকারের? নাকি অন্য কারও? পাঠকরাও বিষয়টা ভেবে দেখবেন।

আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা

লেখক ফলতা এসইজেডে কর্মরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবক, সম্পাদনা : পার্থ কয়াল

ফলতা থানার হরিণডাঙা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বরমালী গ্রামের বাসিন্দা এক ছোট্ট ছেলের জীবন ইতিহাস বর্ণনা করছি।

শৈশবের প্রতিজ্ঞা

আমি তখন ছেলেমানুষ। বয়স মাত্র ছয়। বরমালী স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়তাম। স্কুলে খুব দুষ্টুমি করতাম। এমনকী শিক্ষক মহাশয়কে অনেকবার চক এবং ডাস্টার ছুঁড়ে মেরেছি। আমি প্রায়দিন স্কুলে যেতাম না। গ্রামের কাকা, জ্যাঠা বয়স্ক লোকেরা জোর করে মারধোর করে স্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। দিলে কী হবে, আমি পালিয়ে আসতাম। শিক্ষক মহাশয় বাবা–মাকে স্কুলে আসার জন্য খবর পাঠান, আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। শেষে শিক্ষক মহাশয়ের হাতে–পায়ে ধরে স্কুলেই থেকে গেলাম। প্রথম বছর আমি ফেল করলাম। বাবা–মা আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু গ্রামের গুরুজনেরা বাবা–মাকে বুঝিয়ে আমাকে স্কুলে পাঠালেন। এইভাবে আমি চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হলাম।

একদিকে বাড়ির অর্থনৈতিক দুর্দশা, অন্যদিকে আমরা চার ভাই–বোন। এই অবস্থায় আমার পড়াশোনা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন আমার মনের মধ্যে একটা জেদ তৈরি হল যে, আমাকে পড়াশোনা করতেই হবে। একদিন বাবা–মাকে বললাম, আমাকে কোন আশ্রমে ভর্তি করে দাও। শুনে তাঁদের দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাবার একমাত্র ছেলে আমি। একমাত্র ছেলেকে বাইরে পাঠাতে তিনি রাজি হলেন না। কিন্তু আমাকে পড়াশোনা করতেই হবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এটাই ছিল প্রতিজ্ঞা। শেষে আমাকে 'মহীরামপুর শিশুকানন ওয়েলফেয়ার হোম'–এ ভর্তি করা হল। সেখানে গিয়ে প্রথম অবস্থাতে মন পড়ে থাকত নিজের বাড়ির দিকে। মনে বহু দুঃখ, কান্না চেপে থাকত। অল্প বয়সে এইভাবে আমার এক অসীম ক্ষমতা সৃষ্টি হল।

১৯৯৯ সালে শিশুকাননে আমরা প্রায় ৩৭৫ জন ছেলে ছিলাম। একই সঙ্গে খেলাধূলা, পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া আর গল্প চলত। ফলে এখানে জীবন আনন্দে কাটত। বছরে তিন–চারবার বাড়িতে আসার জন্য ছুটি পেতাম। বাড়িতে যাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। বাড়িতে মা–বাবা–বোনেদের দেখার জন্য চলে আসতাম।

তারপর ওখানে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম। স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রত্যেকেই আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আর এই ভালোবাসার তাগিদেই আমার পড়াশোনার উন্নতি হল। সবক্ষেত্রেই সাহায্য পেতাম। আমার জীবনে তা এখন পর্যন্ত চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মহীরামপুর হাইস্কুল থেকে ২০০৫ সালে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। বাড়িতে যেতে বাবা–মা খুব খুশি হল, বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। আমি তাঁদের সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, তোমরা আমাকে আশির্বাদ করো যাতে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। মাধ্যমিক পাশ করার পরে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে পরামর্শ করলাম যে, এর পরে আমি কী করব, কোনদিকে যাওয়া উচিত। শেষে আমি কারিগরি শিক্ষার জন্য টালিগঞ্জ আইটিআই–তে ভর্তি হলাম। সেখান থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। আইটিআই পাশ করে মহীরামপুর স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার জন্য ভর্তি হলাম। কিন্তু বাড়িতে খুব সংকটের মধ্যে দিন চলছে। বাবা মুখ ফুটে আমাকে কাজ করার জন্য বলতে পারছেন না। দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। মনের মধ্যে একটাই প্রতিজ্ঞা, আমাকে ভালো চাকরি পেতে হবে। শেষে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ফলতা ফ্রি ট্রেড জোনে একটি কোম্পানিতে কাজে যোগ দিলাম। কাজের পাশাপাশি আবার আমি পড়াশোনা শুরু করলাম। ফকিরচাঁদ কলেজে 'নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়'–এর বিএ কোর্সে ভর্তি হলাম। তখনও মন ঠিক কাজের অনুকূল নয়, ইচ্ছা ছিল বড়ো কিছু করার। একটা কথা না বলে পারছি না যে, শৈশবের ছেলেমানুষী প্রতিজ্ঞা আমাকে যে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। ২০০৮ সালের ১১ মে প্রথম যখন আমি কর্মজীবনে নিযুক্ত হই, তখন সেই কোম্পানিতে অল্পসংখ্যক শ্রমিক কাজ করত। বাইরে থেকে মনে হত এ এক রাজপ্রাসাদ। বাইরের খোলসটি খুব চমৎকার বা ঐতিহ্যময়। তা সকলকেই আকর্ষণ করে। দেখে মনে হয়েছিল এখানে আমি কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। কিন্তু নতুন ব্যক্তি কিছু না জানায় কোন কিছু বিচার–বিশ্লেষণ না করেই সহজে নিযুক্ত হয়ে যায়। ভেতরের শাঁসটা সে তখনই টের পাবে, যখন চার দেওয়ালের মধ্যে প্রবেশ করবে।

বাইরের খোলস

একটা মেয়েকে যখন সাজানো হয় বিভিন্ন অলঙ্কার, গয়না, শাড়ি ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, তাকে তখন অপরূপ দেখতে লাগে। এই অপরূপ চাকচিক্য দেখে যে কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হতে বাধ্য। ওই রূপে প্রলুব্ধ হয়ে যখন তার মধ্যে প্রবেশ করা হয়, তখন ওই রূপের মাধুর্য কমতে থাকে। কারণ তার বাইরের রূপের মহিমা থাকলেও ভিতরে তা থাকবেই, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই ভিতরের অবস্থা বাইরের থেকে আলাদা হতে পারে। আর এই ভিতরের অবস্থা থেকেই ব্যক্তিজীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের উন্নতি হতে পারে। তাই ব্যক্তির বাইরের থেকে ভিতরের অবস্থা জানা অবশ্যই দরকার।

ভিতরের অবস্থা

যে কোন কোম্পানিতে দেখা যায় যে, তার বাইরের দৃশ্যটি অতিথিকে আকর্ষণ করার জন্য সাজিয়ে তোলা হয়। তার জন্য যত মূলধন দরকার খরচ করা হয়। তাতে শ্রমিকদের মাইনে বাড়ল কি বাড়ল না, সেদিকে নজর দেওয়া হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় কোম্পানিতে কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নেই, প্রযুক্তির অভাব, পরিকাঠামো বা পরিচালনার অভাব, মেশিনের বয়স পুরনো এবং সর্বোপরি নিয়ম–শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মাসের শেষে প্রোডাকশন ঠিক রাখতে হবে। নাহলে কর্মচারীদের ওপর চাপ পড়বে। বলা বাহুল্য, কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। কারণ প্রত্যেকের সংসার আছে। তাই সংসারের মুখ চেয়ে সবাই নির্বিচারে তা সহ্য করে যায়। অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের (পার্মানেন্ট) বেতন অন্য কর্মচারীদের তুলনায় অধিক ছিল। তাই তাদের কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। ওই কর্মচারীদের কোনরকম অতিরিক্ত সময় (ওভারটাইম) কাজ করানো হয় না। অন্যদিকে, কোম্পানি–কর্মচারী নয় এমন ব্যক্তিদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয়। কারণ তাদের বেতন কম। তারা নির্বিচারে মুখ বুজে কাজ করে চলে। প্রতিবাদ করার মতো সাহস পায় না, পাছে কাজ চলে যায়। কিন্তু প্রত্যেকের মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছে। তবুও বৌ–ছেলেমেয়ের দিকে চেয়ে কাজ করে যেতে হয়। যেখানে একজন কোম্পানি–কর্মচারী পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাইনে পায়, এরা ৪৫০০ থেকে ৭০০০ টাকা মাইনে পায়। এই বিশাল ব্যবধানের মাইনেতে সবাই কাজ করে। কিন্তু সমস্ত ধরনের কর্মচারীদের

... পরবর্তী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

ফলতা বিশেষ শিল্পাঞ্চলের কথা

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরুর কথা

১৯৮৪ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী ফলতায় একটা শিল্পাঞ্চলের স্থাপনা হয়। সে সময়টা বেশ মনে পড়ে। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার তখন দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতাসীন হয়েছে। কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের মূল শ্লোগান তখন, 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে'। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। রাজ্যের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারকে তাই আরও বেশি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।

ঠিক সেই সময়ই সবার অগোচরে প্রত্যন্ত ফলতায় ২৮০ একর জমির ওপর এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড) বা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সূত্রপাত হয়। এই ২৮০ একরের মধ্যে ১৯৩ একর অর্থাৎ বেশিরভাগটাই ছিল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের জমি। বাকি ৮৭ একর জমি কৃষকদের বাস্তু ও কৃষিজমি, যা অধিগ্রহণ করা হয়। এই শিল্পাঞ্চল প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গড়ে উঠলেও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তারাই কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে, বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে দুটো গ্রামের অধিবাসীদের অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করে। অতঃপর শিল্পাঞ্চল নিরুপদ্রবে চালনা করার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, সেই সময়েই ফলতায় বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে। যৌথ হলেও এই শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাই প্রধান, তাদের কথাই শেষ কথা। রাজ্য সরকার এই উদ্যোগে ছোটো শরিক, কেন্দ্রের সহযোগী।

দেওয়ালে তখন জ্বলজ্বল করছে, 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা'র শ্লোগান। কিন্তু ফলতায় তার বিপরীত-যাত্রা। ফলতায় কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা। আর তা রাজ্যের শাসকদের পূর্ণ সহযোগিতায়। এভাবেই ফলতা শিল্পাঞ্চল গোড়ার দিন থেকে রাজনৈতিক স্ববিরোধের সাক্ষী। উদারিকরণের যে প্রক্রিয়ায় ১৯৯১ সাল থেকে পুঁজিপতিদের অধিক ক্ষমতা দেওয়া শুরু হয়, ফলতা শিল্পাঞ্চলে শুরু থেকেই সেই প্রক্রিয়া চালু ছিল। শুরুর সেদিন থেকেই রাজ্য ও কেন্দ্রের উভয় সরকার হাতে হাত ধরে সে পথে চলা শুরু করল, যা আজও অব্যাহত।

সেজ তুমি কার

ফলতার এই শিল্পাঞ্চলটি ২০০৩ সালের গোড়ায় 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' বা সেজ-এ রূপান্তরিত হয়। ইপিজেড-কে এসইজেড বা সেজ-এ পরিণত করার এই সিদ্ধান্ত বা উদ্যোগ একান্তভাবে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশের রপ্তানি বাড়ানোর জন্য শিল্পপতিদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে এই বিশেষ শিল্পাঞ্চলের পরিচালনা, যা কার্যত 'বিদেশি এলাকা' বলে পরিগণিত। অর্থাৎ পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগ দেশের অন্যত্র যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলে, এখানে সেসব কার্যকর হবে না বা শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হবে। উৎপাদিত পণ্যের ওপর শুল্ক-মাশুল বা শিল্প থেকে আয়ের ওপর কর, এসব কিছুই এখানে দিতে হবে না। আয়কর পাঁচবছর পর থেকে ৫০ শতাংশ হারে এবং সাতবছর পর থেকে পুরোপুরি লাগু হবে। শ্রমিক নিয়োগ ও পরিচালনার আইন-কানুন থাকবে শিথিল। ইত্যাদি একগুচ্ছ ছাড় দিয়ে শিল্পপতিদের রপ্তানি-নির্ভর পণ্য উৎপাদনে আকৃষ্ট করার জন্য সেজ-এর পরিকল্পনা।

২০০০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে এক্সিম পলিসি বা রপ্তানি-আমদানি নীতি ঘোষণা করে, সেই নীতি অনুসারে ফলতা ইপিজেড সেজ-এ পরিণত হলেও রাজ্য সরকার সেজ-এর ব্যাপারে যে খুব উদাসীন ছিল বা বিরোধী ছিল, ঘটনাক্রমে কিন্তু তার নজির মেলে না। যদিও সেজ নিয়ে যখন পরবর্তী সময়ে দেশজুড়ে বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছে, তখন বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলো সেজ বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছে। সেজ নিয়ে গবেষণার কাজে ২০০৮ সালে আমি যখন সিপিএমের তৎকালীন সাংসদ হান্নান মোল্লা এবং সিটুর রাজ্য সম্পাদক কালী ঘোষের সাক্ষাৎকার নিই, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে সেজ তৈরির যাবতীয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপিয়ে দেন। হান্নান মোল্লা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ কোন স্বাধীন দেশ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি রাজ্য কার্যকর করতে বাধ্য। সেজন্য নীতিগতভাবে আমরা সেজ-বিরোধী হলেও এরাজ্যে সেজ প্রয়োগে সম্মত হয়েছি। আর কালী ঘোষ বললেন, ফলতা তো কংগ্রেস আমলে হয়েছে। তবু ওখানে শ্রম আইন যাতে কার্যকর হয়, শ্রমিকদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, সেটা আমরা দেখছি।

অর্থাৎ এরাজ্যের শাসকদলের নেতারা সেজ গঠনের কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে রাজি নন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দেশের মধ্যে এরাজ্যেই প্রথম সেজ আইন তৈরি করা হয় এবং রাজ্য বিধানসভায় তা বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায় ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার তখনও সেজ আইন তৈরি করেনি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই ২০০৪ সালে মণিকাঞ্চন নামে অলঙ্কার শিল্পের সেজ এবং ২০০৫ সালে উইপ্রো তথ্যপ্রযুক্তি সেজ সল্টলেক উপনগরীতে স্থাপিত হয়। এছাড়া আরও বেশ কিছু সেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ রাজ্য সরকার নেয়, যার মধ্যে বৃহত্তম প্রকল্পটি ছিল নন্দীগ্রামে সালেম গোষ্ঠীর কেমিকাল হাব গড়ার প্রস্তাব। যে প্রকল্প রূপায়িত করতে রাজ্য সরকারের উৎসাহ উদ্যোগের পরিণতিতে নন্দীগ্রাম অত্যাচার ও প্রতিরোধের পীঠস্থানে পরিণত হয়। আর সেজ গোটা দেশ জুড়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে ফলতা সেজ-এর জমির সমস্যায় এক নজর দেওয়া যাক।

জমি নিয়ে জট

ফলতায় গঙ্গার তীরে তিনটি গ্রাম সেজ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অকালমেঘ ও সিমুলবেরিয়া গ্রাম দুটি পুরো উচ্ছেদ হয়। নৈনান গ্রামটি আংশিক উচ্ছেদ হয়ে সেজ-এর কাঁটাতার দেওয়া উঁচু পাঁচিলের পাশে সংকুচিত হয়ে টিকে আছে।এই তিনটি গ্রামের প্রায় ৫০০ পরিবার তাদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়। এই পরিবারগুলি ছিল মূলত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। অল্পস্বল্প নিজের জমি বা পরের জমিতে চাষবাস করার পাশাপাশি নদী থেকে মাছ ধরে তাদের জীবিকা চলত পুরুষানুক্রমে। সেজ প্রক্রিয়ায় তাদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হল জীবিকা হারিয়ে। বাস্তুজমির বদলে পুনর্বাসন মিললেও জীবিকার পুনর্বাসন মিলল না। সে কথা পরে।

বাস্তু থেকে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য পার্শ্ববর্তী গোপালপুর গ্রামের কৃষিজমি ৮০ একর অধিগ্রহণ করে সরকার। সেখানে মাটি ফেলে উঁচু করে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোকে জমি দেওয়া হয় ৪-১০ শতক পর্যন্ত। নতুন গ্রামের নাম হয় হাইল্যান্ড। নতুন করে ঘর বাঁধার জন্য দেওয়া হয় ৫০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। আর কৃষিজমির দাম ধার্য করা হয় ১৫,৩৭০ টাকা প্রতি একর। কৃষিজমির জন্য এই সামান্য

ক্ষতিপূরণের টাকাও একবারে দেওয়া হয় না। ২৫ বছর পর কে কত জমির টাকা পেয়েছে আর কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাকি আছে, এ নিয়েও প্রচুর সমস্যা তৈরি হয়েছে। হাইল্যান্ড গ্রামের উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের অন্যতম প্রবীণ বাসিন্দা জাহির আহমেদ বললেন, তাঁর ১ একর ১০ শতক জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল। তার মধ্যে ১০ একর জমি বাস্তু হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন। বাকি জমির অর্ধেক ক্ষতিপূরণ তিনি পেয়েছেন, অর্ধেক পাননি। কেউবা ৮০ শতাংশ জমির ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন, ২০ শতাংশের টাকা পাননি।

কৃষকদের আরও ক্ষোভ, বামফ্রন্ট রাজত্বে তাদের পাওনা বাকি ক্ষতিপূরণ নিয়ে কেউ কিছু করেনি। এখন চাকা ঘুরতে শুরু করায় বিরোধী দলের নেতৃত্বে তারা আবার নড়াচড়া শুরু করে এবং নতুন করে ক্ষতিপূরণের চেক পাওয়া শুরু হয়। দেখা যায়, কেউ ৫ টাকার চেক পেয়েছে, কেউ বা ২৮.৯৮ টাকার। কে বা কারা কোথায় বসে ক্ষতিপূরণের হিসাব কষছে এবং চেক পাঠাচ্ছে, উচ্ছেদ হওয়া হতভাগ্য মানুষগুলো তা জানে না। কলকাতায় এসে খোঁজখবর করার অবস্থাও তাদের নেই। তাই জমির বাকি ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য তারা উদীয়মান বিরোধী দলের নেতাদের মুখাপেক্ষী, তবে তাদের রূপও যেভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে কতদিন তাদের ওপর ভরসা করা যাবে, সে সংশয়ও রয়েছে।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ট্রাডিশন সমানে চলেছে

ঘরের বদলে ঘর না হয় হল, যদিও সে জমির পাট্টা এখনও মেলেনি, কিন্তু জীবিকার সংস্থান কী হবে? কৃষিজীবীর জমি গেল, মৎস্যজীবীর নদী। হাইল্যান্ডে উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলোর বসতি আর গঙ্গানদীর মাঝখানে বিশাল পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে গেল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। পার্টি নেতারা তো বলেইছিলেন, এছাড়া তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সেজ–এর উদ্বোধন করতে এসে ভাষণ দিয়েছিলেন, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন যাতে সেজ–এ চাকরি পায়, তাঁরা তার বন্দোবস্ত করবেন।

তারপর পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। সেজ–এ কারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে, উৎপাদনের পরিমাণ এবং তা থেকে আয়ও ভালোমাত্রায় বেড়েছে। কিন্তু উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলোর কথা কে মনে রেখেছে? যারা সেজ–এর ফলে জীবিকাচ্যুত হয়েছিল, সেই প্রজন্মের কেউ সেজ–এ কাজ পেয়েছে, এমন খুঁজে পাওয়া গেল না। নতুন প্রজন্মের যুবকেরা এবং মহিলারা এখন অনেকে 'জোনের কাজে' যাচ্ছে (এলাকার মানুষ সেজ–কে সংক্ষিপ্ত করে বলে জোন)। একজন জানালেন, উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির খুব বেশি হলে ৫০ শতাংশ থেকে যুবক ও মহিলারা এখন জোনে কাজ পাচ্ছে। কিন্তু সেটা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নয়। প্রতিশ্রুতি ছিল, শিল্পে কাজ করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সম্প্রতি সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিতর্কের পর্বে এমন প্রতিশ্রুতি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে শোনা গেছে। ট্রাডিশান বজায় রেখে চলেছেন তিনি?

প্রশিক্ষণহীন স্থানীয় মানুষ সেজ–এ অদক্ষ কাজের জন্য বিবেচিত হয়, যে কাজ মালিকেরা মূলত ঠিকাদার মারফত শ্রমিক নিয়োগ করে সম্পন্ন করে। দক্ষ শ্রমিক, শিক্ষিত শ্রমিক ও সুপারভাইজার–ম্যানেজাররা বাইরে থেকে আসে। স্থানীয় যুবক ও মহিলারা প্রতিদিন শিফ্‌ট শুরুর আগে সেজ–এর গেটে জড়ো হয়। ঠিকাদার তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে কাজে লোক পাঠায়। একই লোক রোজ কাজ করলে স্থায়ী হবার দাবি করতে পারে, তাই কিছুদিন কাজ করার পর তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। এক দলের জায়গায় অন্য দল কাজ করে। এতে কর্মসংস্থান বেড়ে যায় (একেকজন মাসে ১৫ দিন কাজ করলে দ্বিগুণ কর্মসংস্থান, ১০ দিন কাজ করলে তিনগুণ কর্মসংস্থান হয়)। আবার স্থায়ীকরণের উটকো দাবিও এড়ানো যায়। এমনই সুখের কাজ মেলে জোন–এ।

সেজ–এর ভেতরের কথা

ফলতার সেজ–এর ভেতরে খানিকটা ঘোরার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। চারটে কারখানার ভেতরেও অনুমতি নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। ভেতরে সবচেয়ে বড়ো বড়ো শেডগুলো হচ্ছে প্লাস্টিক কারখানার। এমন ১৪টা কারখানা আছে, যেখানে দেশ–বিদেশ থেকে ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ করে আনা হয়। বিশাল শেডের তলায় বিরাট বিরাট বস্তায় সেগুলো জড়ো করে রাখা থাকে। অসংখ্য মহিলা এই প্লাস্টিকগুলো বস্তা থেকে বের করে সাফাই করার কাজে যুক্ত। স্থানীয় মানুষের ভাষায় এটা 'কচড়া কাজ'। হিন্দিতে কচড়া মানে নোংরা। কাজটা সত্যিই নোংরা ঘাঁটার কাজ। ব্যবহৃত প্লাস্টিকগুলো এমনকী সুদূর আমেরিকা থেকে জাহাজে করে আসে। তার মধ্যে পচা খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে রক্ত–মাংস কী–ই না থাকে! প্লাস্টিক পরিষ্কার করে তার রিসাইক্লিং করে তা আবার বিদেশে পাঠানো হয়।

আমাদের দেশে মহিলাদের রোজগারের পথ দুষ্প্রাপ্য। তাই তাদের দিয়ে কম মজুরিতে যত নোংরা কাজ, অস্বাস্থ্যকর কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। ফলতা সেজ–এ মহিলা কর্মীর সংখ্যা নজরে পড়ার মতো। শিফ্‌ট ভাঙার সময় দেখা যাবে, বহু দূর দূর গ্রাম থেকে দলে দলে মহিলারা আসছে কাজ করতে। কেউ কেউ এক–দেড়ঘন্টা হেঁটে কর্মস্থলে পৌঁছায়। এদের বেশিরভাগই এই কচড়া কাজে যুক্ত। এছাড়া ২০টি টেক্সটাইল কারখানা আছে, যেখানে গ্লাভ্‌স থেকে মোজা নানান কিছু তৈরি হয়। সেইসব কারখানাতেও চেকিং প্যাকিং প্রভৃতি কাজে প্রচুর মহিলা কাজ করে। এরা প্রায় সবাই ঠিকাদারের অধীন। দৈনিক মজুরি ইদানীং বেড়ে হয়েছে ৮১ টাকা। কিছু মাস আগেও ছিল ৬৫ টাকা। জমানা বদলের হাওয়ায় শ্রমিকরা কিছুটা দাবি আদায় করে নিয়েছে। যদিও সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির হিসেবে প্লাস্টিক কারখানার অদক্ষ শ্রমিকের মজুরিও ১২৩ টাকা হওয়ার কথা।

সরকারের কোষাগারে ঘাটতি দিয়ে সেজ গঠনের পেছনে অন্যতম যুক্তি ছিল বর্ধিত কর্মসংস্থান ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বমানের পণ্য প্রস্তুত করা। কর্মসংস্থানের চেহারাটা তো আমরা দেখলাম। শ্রম আইনের কোনও তোয়াক্কা না করে ঠিকাশ্রমিকদের দিয়েই ভেতরে বেশিরভাগ কাজ চালানো হচ্ছে। ইএসআই, প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুযোগও কম শ্রমিকই পায়। প্লাস্টিকের নোংরা ঘেঁটে শরীরে দগদগে চর্মরোগ নিয়ে হাইল্যান্ডে রয়েছেন জাহানারা বিবি। রোগ বেড়ে সারা শরীরে দাগড়া দাগড়া ঘা ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর কাজ গেছে, ক্ষতিপূরণ কিছুই পাননি। এমন বহু শ্রমিক আছে, বিশেষত প্যাটন কারখানায় কর্মরত, যাদের এক বা একাধিক আঙুল চলে গেছে মেশিনের গর্তে। কিন্তু তারা ক্ষতিপূরণ পায়নি। সেজ–এর ভেতরে কারখানাগুলোয় কোন ইউনিয়ন নেই। ইউনিয়ন অফিস বাইরে। তবে সেটা ঠিকাদারদের অফিসও বলা চলে। ইউনিয়ন নেতারা নামে–বেনামে ঠিকাদারি করে পয়সা কামায়। রক্ষকই ভক্ষক। সুতরাং শ্রমিকেরা কার ওপরে ভরসা করবে? সিপিএমের নেতাদের পাশাপাশি হাওয়া বদলের সুযোগে তৃণমূলের নেতারাও ঠিকাদারিতে যোগ দিচ্ছে। 'যে যায় লঙ্কায় ...'!

কারও পৌষমাস ...

উচ্ছেদ হওয়া স্থানীয় মানুষ এবং শ্রমিকদের যখন এমন অবস্থা, তখন সেজ–এর ভেতরে কারখানাগুলোর অবস্থা কিন্তু রমরমা। কিছু কিছু কারখানায় মন্দার প্রভাব বা অন্য কারণে সংকট থাকলেও, সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ও মুনাফার হার দ্রুতই বেড়ে চলেছে। ২০০৫–০৬ সাল থেকে

২০০৮–০৯ মাত্র তিন বছরে ফলতা সেজ থেকে রপ্তানি ৫২৪.৯৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৬১.২৬ কোটি টাকা। তিন বছরে প্রায় ৫৫ শতাংশ বেড়েছে। উল্লেখযোগ্য হল, বিভিন্ন ধরনের কারখানার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে প্লাস্টিক, রাবার ও সিনথেটিক কারখানাগুলোর রপ্তানি, যা ২০০৫–০৬ সালে ৩৩.১৮ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৮.৮৯ কোটি, বৃদ্ধি আড়াই গুণেরও বেশি।

উন্নয়নের গল্পটা এখানে ফাঁস হয়ে যায়। অদক্ষ শ্রম সস্তায় লুটে নেওয়াতেই বেশি মুনাফা। শ্রমিক তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে হাজার শ্রমিকের লাইন আছে বাইরে। 'পোষায় কাজ করো, নাহলে রাস্তা দেখো' — এটা উন্নয়নের সংস্কৃতি। মালিক–ঠিকাদার–নেতা সবার একই কথা। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অবশ্য এই গল্পটাই চলছে। স্থায়ী শ্রমিকদের কাজ অস্থায়ী ঠিকাশ্রমিকদের দিয়ে সস্তায় করিয়ে নিয়ে মুনাফার পাহাড় তৈরি করছে পুঁজির মালিকরা। ফলতা সেজ এই সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। সেজ তৈরির মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রের শাসকেরা উন্নয়নের যে মডেল তৈরি করতে চেয়েছে, নগ্ন শোষণের যে সংস্কৃতি তৈরি করতে চেয়েছে, এরাজ্যে বামফ্রন্ট জামানায় বহু আগেই তো সে মডেল, সে সংস্কৃতি তৈরি হয়ে আছে।

প্রথমে ইপিজেড এবং পরে সেজ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষার জন্য সারা ভারতে প্রথম যে চারটি অঞ্চল বেছে নেওয়া হয়েছিল, সহজেই পশ্চিমবঙ্গের ফলতা তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সরকারই প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন তৈরি করে সেজকে বৈধতা দিতে চেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রথম নন্দীগ্রামে সেজ গঠনের জন্য গণহত্যা ও গণধর্ষণকাণ্ড সংঘটিত করেছিল। আবার এই নন্দীগ্রামেই সেজ গঠনের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে দীর্ঘতম এবং বৃহত্তম প্রতিরোধ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভারতবর্ষের সেজ মানচিত্রে তাই পশ্চিমবঙ্গ একটা বিশেষ স্থান। ফলতা থেকে নন্দীগ্রাম — প্রথম প্রয়োগ থেকে প্রথম প্রতিরোধ। ইতিহাস বোধহয় এভাবেই এগিয়ে চলে।

ফলতা এসইজেড–এ শ্রমিকের জোগান

পার্থ কয়াল

ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থানীয় পরিভাষায় 'ফি–টেড জোন' নামে পরিচিত। Free Trade Zone কথাটির অপভ্রংশ এটি। যদিও ফলতা নাকি কোনকালেই Free Trade Zone বা FTZ ছিল না। এর শুরু হয় ১৯৮৪ সালে, Export Processing Zone বা EPZ হিসাবে। তখন প্রাইম মিনিস্টার অফিস পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য বিশেষ স্কিম হিসাবে এটাকে চালু করে।

২০০৩ সালে এসে এটা Special Economic Zone বা SEZ হিসাবে কাজ শুরু করে। তার কারণ দেখানো হয়েছিল, এখানকার কারখানাগুলি যাতে আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয় এবং এর জন্য শ্রমিক নিয়োগ করার শর্ত যেগুলি রয়েছে — নানান বিধিনিষেধ — সেগুলির হাত থেকে যাতে এই জোন পরিত্রাণ পায়। নয় নয় করে এই এসইজেড–এর বয়স ২৫ হল। ফলতা সেজ সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে, ফলতা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মতোই হয়ে উঠতে চায়।

এরকম নানা কিছু জড়িয়ে আছে ফলতা সেজের সাথে। আর তার সাথে জড়িয়ে আছে হাজার আটেক শ্রমিক, যার মধ্যে একটা বড়ো অংশই চাকরি করে ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসাবে। অবশ্যই এদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাটাই বেশি। তবে বিগতদিনে নানা পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে।

ফলতায় আগে যারা কাজ করত

ফলতায় একদম প্রথমে কেউ কাজ করতে রাজি হত না। গ্রামে গ্রামে লোক ঘুরত ফলতায় কাজ করতে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। গোড়ার দিকে কারখানাও চালু ছিল বেশ অনেকগুলি। এদের পুরোটাই প্রায় মিডিয়াম এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি। সুতরাং তার জন্য প্রয়োজনীয় যে শ্রমশক্তি, তার দক্ষতা অর্জনের জন্য পূর্ব–অর্জিত পারদর্শিতার খুব একটা দরকার হত না। কারখানায় কাজ করতে করতেই সেই দক্ষতা ক্রমশ অর্জন করে নেওয়া যেত।

প্রথমেই যেটা বলেছি, পিছিয়ে পড়া ব্লক হওয়ার জন্য স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতিকল্পে ইপিজেড–এর প্রতিষ্ঠা। যারা অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আসত, তারা কোন জায়গায় কাজ না পেয়েই আসত। আর এখানকার গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় কৃষি সংক্রান্ত কাজ সবাই করত, অবশ্যই নিম্নবর্গের মানুষ বাদ দিয়ে। যারা চর্মকার, জেলে (১৯৮০–র দশকে মাছ ধরার ব্যবসায় ভিন্ন লোকজন আসতে শুরু করছে, আগের মতো আর তা লাভজনক থাকছে না), যারা বেতের ঝুড়ি–চুবড়ি এককালে বুনত, যারা মাছের ডিম ফুটিয়ে পোনা তৈরি করত, যারা বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত — এসমস্ত লোকজনই ফলতা ফি–টেড জোনের কাজে চলে আসতে থাকে। এছাড়া, ওই জোন স্থাপনের জন্য যারা ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল অর্থাৎ অকালমেঘ ও শিমূলবেড় গ্রামের মানুষ কাজ পায়। এরাও নিম্নবর্গের এবং এদের মধ্যে হিন্দু–মুসলমান দুই অংশই ছিল।

সত্তরের দশকে ফলতায় কর্মসংস্থানের প্রকৃতি

ফলতার বহু কারখানাই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে তাদের মাল রপ্তানি করত। কিন্তু আশির দশকের শেষদিকে পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে এই রপ্তানি মার খায়। একই সাথে চীন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে শুরু করে এই সময়েই। আর সরকারি লাল ফিতের ফাঁসও তখন আলগা নয়। শ্রম আইনগুলিও তখন আজকের মতো আলগা ছিল না। সুতরাং ফলতার কারখানাগুলি ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। এদিকে চাষের কাজও ক্রমশ অলাভজনক হচ্ছে। ১৯৮৭–৮৮ থেকে সারের দাম বাড়তে থাকে। চাষের খরচ বাড়ে। এদিকে মূল্যবৃদ্ধির কারণে আগের মতো খরচে আর সংসার চালানো সম্ভব নয়।

সত্তরের শেষ থেকে ২০০০–এ অবস্থা যা দাঁড়াল

অনেক কারখানাই বন্ধ। অথচ কাজ করার লোক আছে প্রচুর। কিন্তু তাদের কোন দক্ষতা নেই। তাই এই শ্রমিকদের কাজে লাগালে বেশি মজুরিও লাগছে না। আর কারখানাগুলিও চাইছিল পুরনো শ্রমিকদের বাদ দিতে। তাদের দিক থেকে কয়েকটা কারণ ছিল এইরকম :

- একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করার ফলে একটা একতাবোধ তৈরি হয়। বিশেষত, নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে একটা সহজাত ঐক্যবোধ লক্ষ্য করা যায়।
- নিম্নবর্গীয় মানুষের আবেগ বা ক্ষোভের প্রকাশ সরাসরি। এর সাথে মালিক আর কারখানার অন্যান্য বাবুরাও পরিচিত নয়। সুতরাং দুটি পক্ষই একে অপরকে বুঝে উঠতে পারত না, ফলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট প্রায়ই লেগে থাকত।

- স্থানীয় মানুষ যদি কারখানায় কাজ পায়, কারখানা সংক্রান্ত কোন সমস্যায় স্থানীয় সমাজ দ্রুত এগিয়ে আসে। ফলে ঝামেলা বাড়ে।
- চতুর্থত, কারখানার কাজে নানান ধরনের উন্নত মেশিনের ব্যবহার এবং তা ঠিকঠাক ব্যবহার করতে হলে একটু–আধটু লেখাপড়া জানাও দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষত, যৎসামান্য ইংরেজি জানতে হয়। কিন্তু তা নিম্নবর্গ থেকে আসা শ্রমিকদের মধ্যে একেবারেই অপ্রতুল।

ফলত বাইরে থেকে অর্থাৎ এসইজেড–এর খুব একটা কাছাকাছি বাস নয়, এমন লোকেরা কারখানায় কাজ করতে শুরু করে। কারখানা কর্তৃপক্ষও এই ধরনের লোকেদের কাজে নিতে পছন্দ করে। ক্রমশ দেখা যায়, কাজে যোগদানকারী অদক্ষ শ্রমিকেরাও বেশিরভাগ আর স্থানীয় নয়।

অথচ কারখানার বাইরেই রয়েছে এমন মানুষ যারা কাজের জন্য চেষ্টা করছে। এদের সংখ্যাটা প্রচুর এবং তা বাড়ছে। জমিতে চাষের কাজ কমে যাওয়ার ফলে — সমাজকাঠামোয় যারা একটু উঁচুতে রয়েছে, যেমন কায়েত, মাহিষ্য বা কুম্ভকারদের ঘরের ছেলে–বউরাও কাজের সন্ধানে বেরিয়ে আসতে লাগল এই জোনের দিকে। এরা কেউই তেমন ঝামেলা পাকানোর লোক নয়। কাজ চলে গেলে প্রতিবাদ করে। কিন্তু স্থানীয় পাড়াগুলো থেকে লোক কম আসায় শেষপর্যন্ত সেই প্রতিবাদ ইত্যাদিতে স্থানীয় সমাজের ভূমিকা থাকে না। আবার কেউ কেউ একটু–আধটু লেখাপড়া শিখে, যেমন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বা স্নাতক হওয়ায়, তাদের দিয়ে লেবারের কাজের বদলে সুপারভাইজারের কাজ, খাতা লেখার কাজ (অবশ্যই প্রয়োজন মতো) করানো যায়। অথচ খুব একটা বেশি পয়সা দিতে হয় না। কারখানা কর্তৃপক্ষ এই অংশের মেজাজ–মর্জি, হাব–ভাব খানিকটা বুঝতেও পারে।

সুতরাং ক্রমশ সমাজের এই অংশ থেকে এবং অবশ্যই জোনের একটু দূর থেকে আগত শ্রমিকেরা কাজ পেতে শুরু করল। আর স্থানীয় বাসিন্দারা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ থেকে ছাঁটাই হতে শুরু করল। সেই জায়গাটা ভরাট করতে শুরু করল সমাজকাঠামোয় অপেক্ষাকৃত উঁচুতে থাকা মানুষজন, যারা এখান থেকে আয়ের কিছুটা বাঁচিয়ে সেই অর্থে অন্যত্র মুদির দোকান, চায়ের দোকান বা অন্য ব্যবসা করে।

ফলতা এসইজেড–এর ক্যাচড়া বৃত্তান্ত

শুভেন্দু বক্সী

ফলতা এসইজেড–এর ১ নং সেক্টরে প্লাস্টন, রিমা, অনিতা, প্রোমজোমের মতো অনেক ক্যাচড়া কারখানা আছে। ওই সমস্ত ক্যাচড়া কারখানায় ৯৯% মহিলা কর্মী। এরা আসে স্থানীয় বিভিন্ন গ্রাম থেকে এবং বহু দূরদূরান্ত থেকে, যেমন সরিষা, ডায়মন্ডহারবার, দস্তিপুর, আমতলা থেকেও আসে। এই সমস্ত কারখানায় ডিউটি হয় দুটি শিফ্‌টে। প্রথমটা সকাল ছ'টা থেকে বেলা দুটো এবং পরেরটা দুটো থেকে রাত দশটা। দৈনিক মজুরি ৮১ টাকা, নো ওয়ার্ক নো পে। প্রোমজোমের কয়েকজন কর্মীর কথা অনুযায়ী, ওই কারখানায় অনেক কর্মী পাঁচ–ছ'বছর কাজ করছে, কিন্তু তারা মজুরি পায় নতুন কর্মীদের মতোই। এতদিন কাজ করা সত্ত্বেও কারও ইএসআই কার্ড নেই এবং কোন প্রভিডেন্ট ফান্ডও নেই। যদি কোন কর্মী দুর্ঘটনায় পড়ে, তবে কন্ট্রাক্টর ১–২ হাজার টাকা সাহায্য করে কর্তব্য পালন করে। প্রথম শিফ্‌টে ডিউটি থাকলে ভোর চারটের সময় উঠে বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম সেরে ভাড়া করা অটোতে চেপে বা পায়ে হেঁটে কারখানায় হাজির হতে হয়। এর জন্য অটোওয়ালাকে মাথা পিছু ভাড়া দিতে হয়। ওদের কথা অনুযায়ী, দ্বিতীয় শিফ্‌ট ডিউটি ভালো। তাতে বাড়ির সমস্ত কাজ সেরে মেয়েরা ডিউটিতে যেতে পারে। সারা বছরই কমবেশি কাজ হয়, তবে বর্ষাকালে কাজ কম থাকে। সেইসময় নতুন কর্মীরা বস্তি হয়ে যায়। কেবলমাত্র অভিজ্ঞ এবং পুরনো কর্মীরাই কাজ পায়। সম্প্রতি প্লাস্টন কারখানায় আগুন লাগার ফলে সেখানকার বেশিরভাগ কর্মীই কর্মহীন। তাদের মধ্যে কিছু কিছু কর্মী অন্যান্য কারখানায় কাজ পেয়েছে। ওখানকার কর্মীদের ধারণা মালিকপক্ষই হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। ওইসমস্ত কারখানায় ব্যবহৃত প্লাস্টিকের মধ্যে থেকে আগে বাছাই করা হয়, তারপর দানা তৈরি করা হয়। দানা তৈরির সময় দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত হয়। অথচ কাউকেই কোন মুখোশ (মাস্ক) দেওয়া হয় না, কর্মীরা মুখে গামছা বেঁধে কাজ করে। ওখানে বাতাসও দুর্গন্ধময়। প্রথম প্রথম যারা কাজে যায়, সেই গন্ধ সহ্য করতে পারে না, পরে সহ্য হয়ে যায়। প্রোমজোমের একজন কর্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনারা যা পরিশ্রম করেন আর যা মজুরি পান, সেটা কি আপনাদের কাছে ঠিক মনে হয়?' এর উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা ঠিক মজুরি পাই'। একজন তো বলেই ফেললেন, 'এই কারখানাগুলো ছিল বলে অনেক লোক করে কম্মে খাচ্ছে, নাহলে চুরিচামারি বেড়ে যেত।' সারা বছরে মাইনে ছাড়া অতিরিক্ত পাওনা হল, পঁচিশে ডিসেম্বর এক টুকরো কেক, রথে জিলিপি, বিশ্বকর্মা পুজোয় একটা মিষ্টির প্যাকেট — এতেই তারা খুশি। শোনা যাচ্ছে যে, মজুরি বেড়ে একশ টাকা হবে, তবে তখন বয়স্ক মহিলাদের কাজে নেওয়া হবে না। ওই সমস্ত কারখানায় বেশিরভাগ কর্মীই জানে না, তারা কোন মালিকের হয়ে কাজ করে। প্রোমজোমের অনেক কর্মীই ছ'টা–দুটো ডিউটি করার পরে জুতা কারখানায় ফুরনে কাজ করে। তার ফলে অতিরিক্ত ৫০–৬০ টাকা উপার্জন হয়। ওই সমস্ত কারখানায় কর্মীরা প্রতিনিয়ত চিন্তায় থাকে, আগামীকাল আমার কাজ থাকবে তো?

আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কাজের ধরন বা ক্ষমতা প্রায় একই ধরনের। উভয়ে একই পরিশ্রম করে থাকে, অথচ তাদের বেতন হল আলাদা। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকা উচিত, কিন্তু তার একটা সীমা থাকা অবশ্যই দরকার।

আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি, সেখানে প্রায় ২৫০–৩০০ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। এদের মধ্যে প্রায় ১৮০ জনের মাইনে প্রায় ৪৫০০–৭০০০ টাকার মধ্যে, ৭০ জনের মাইনে প্রায় ১৫০০০–৩০০০০ টাকার মধ্যে এবং ২০ জনের মাইনে ৪৫০০০–৭০০০০ টাকার মধ্যে। এর থেকে দেখা যায়, বেশিরভাগ কর্মচারী অল্প বেতনে কাজ করে থাকে। ফলে কোম্পানি কম বেতন দিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এ যেন সেই বড়ো মাছ ছোটো মাছকে গিলে ফেলার গল্প। কিন্তু এটা গল্প নয় সত্যি। এই সমস্ত কম মজুরি প্রাপ্ত কর্মচারীদের ওপর জোর জুলুম আমার মনে এক বড়ো অনুশোচনার সৃষ্টি করে। এই অবস্থা দেখে আমার নিজের খুব দুঃখ লাগে। কিন্তু কোন উপায় থাকে না। এর জন্য দরকার প্রত্যেকের সহযোগিতা ও

জোটবদ্ধতা। আমাদের কোম্পানিতে কোন ইউনিয়ন না থাকায় এর প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ ১–১৫ জন মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিচালন কমিটি তৈরি হয়। তাদের ইচ্ছা অনুসারে সবকিছু মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। যদি ভবিষ্যতে এর পরিবর্তন হয়, তাহলে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে উপকৃত হব।

শেনঝেন থেকে ফলতা
এসইজেড : তিন দশকের পরিক্রমা

জিতেন নন্দী

১৯৭২ সালে ঘোর কমিউনিস্ট বিরোধী বলে পরিচিত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন 'কমিউনিস্ট চীন'–এ। সাতদিনের চীন সফরে চেয়ারম্যান মাও সেতুঙ এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং সমঝোতা সংক্রান্ত তথ্যাদি গোপন রাখা হয়েছিল ২৫ বছর। ২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা প্রকাশ (ডিক্লাসিফাই) করে। আমরা জানতে পারি, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয় ছাড়াও ছিল তাইওয়ান সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিনী সিদ্ধান্ত : তাইওয়ানের স্বাধীনতা আন্দোলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর মদত দেবে না (তবে মার্কিন মদত নিরপেক্ষভাবে তা গড়ে উঠলে তাকে দমনও তারা করবে না)। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় জাপানের সামরিক হস্তক্ষেপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুৎসাহিত করবে।

আপাতভাবে এই গোপন চুক্তির সঙ্গে এসইজেডের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটা ঘেরাটোপের আড়ালে শিল্প এবং উৎপাদনের পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল ওই তাইওয়ান (এবং দক্ষিণ কোরিয়া) থেকেই। এই দুই দেশে যখন পরীক্ষাটা শুরু হল, তখন নাম ছিল এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, সংক্ষেপে ইপিজেড। পরে দফায় দফায় সংস্কার করে দাঁড়াল স্পেশাল ইকনমিক জোন বা এসইজেড। তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া ছিল ১৯৭০–এর দশক পর্যন্ত আমেরিকার কাছে কমিউনিজম–বিরোধিতার গড়। কোরিয়ায় মার্কিন দখলদারীতে এবং তাইওয়ানে কুওমিনটাঙের আমলে এক বিশেষ ধরনের পরিকল্পিত ভূমি সংস্কার ঘটানো হয়েছিল। তার জের ধরেই এসেছিল অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক ইপিজেড গড়ার প্রক্রিয়া। এই দুই দেশের আইন ও সরকারি পরিকল্পনা এখানে রপ্তানিযোগ্য ইলেক্ট্রনিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

১৯৭২ সালের নিক্সন–মাও বোঝাপড়া পুঁজির এই নতুন পরীক্ষা–নিরীক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মাও সেতুঙ এবং চৌ এন লাই বলতে চেয়েছিলেন, তাইওয়ান চীনের অংশ। নিক্সন বা কিসিঞ্জার তাতে মোটেই আপত্তি করেননি। কিন্তু তাইওয়ানের রপ্তানি–নির্ভর অর্থনীতিতে উভয়পক্ষই হাত দিতে চায়নি। ১৯৬০–এর দশকেই চীনারাষ্ট্র ঋণ শোধ করার জন্য বিদেশি মুদ্রার চাহিদা, খাদ্যাভাব এবং আমদানি–নির্ভরতা থেকে পরিত্রাণের জন্য রপ্তানি বাড়াতে চাইছিল। এদিকে চীন 'সমাজতান্ত্রিক'। দেঙ শিয়াও পিঙ চীনের ক্ষমতায় এসে এই সহাবস্থানকে তাত্ত্বিক রূপ দিলেন এইভাবে : 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা'। তাঁর যুক্তিটা ছিল এইরকম, ১০০ কোটি মানুষের মূল ভূখণ্ডে 'সমাজতন্ত্র' রয়েছে, তাকে কি আর ২ কোটি মানুষের হঙকঙ আর ৫.৫ কোটির তাইওয়ান গিলে নিতে পারবে? মোটেই নয়।

অর্থাৎ ক্ষমতার দুই মেরুতে প্রশ্নটা দাঁড়াল, কে কত বড়ো মাছ হয়ে ছোটো মাছকে গিলে খেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে পুঁজির একটা বিশ্বমন যেন গড়ে উঠছে, সে মন যেন একটা নতুন ব্যবহারিক ধাঁচা গড়ে নিতে চাইছে। তাইওয়ান, হঙকঙ তার কাছে দৃষ্টান্ত। সে দৃষ্টান্ত সফল না বিফল, তার চেয়েও বড়ো কথা হল তার ব্যঞ্জনা, তার ইঙ্গিত। গোটা দুনিয়াটাকে সে যেন ব্যবহার করতে চাইছে এক নতুন আঙ্গিকে। পশ্চিমি দুনিয়ায় পরিবেশের প্রশ্নটা সামাজিক রূপ পেয়ে গেছে। সেটা মাথায় রেখে পরিবেশ–বৈরী ওয়ার্কশপের অবস্থানটা ঠিক করতে হবে।

শেনঝেন বাছাই হয়েছিল মনে হয় বিভিন্ন খেলুড়েদের এরকমই পারস্পরিক সমমনস্কতার ভিত্তিতে। ১৯৭৯ সালে চীনা সরকার গুয়াঙদঙ প্রদেশের শেনঝেন এবং ফুজিয়ান প্রদেশের ঝুহাই–তে এসইজেড গড়ার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১–র মধ্যে শেনঝেনের পরিকাঠামোতে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে গেল ১১% থেকে ৫০%। বেশিরভাগটাই এল হঙকঙ এবং ম্যাকাও থেকে, ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট, রেসিডেন্সিয়াল হাউজিং এবং ট্যুরিস্ট ডেভলপমেন্ট খাতে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে হঙকঙের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলি শেনঝেনে ৪০ লক্ষ মানুষকে নিয়োগ করেছিল, হঙকঙে তাদের কর্মী ছিল ৫ লক্ষ। শেনঝেনের ৯৬% টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এবং ৯৫% গারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মালিকানা ছিল হঙকঙের কোম্পানিগুলির। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে শেনঝেনের রপ্তানি বেড়েছিল বছরে গড়ে প্রায় ৭০% হারে। অন্য চীনা এসইজেডে অবশ্য এই হারে রপ্তানি ও বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ হয়নি।

শেনঝেন শহরের ১.২ কোটি বাসিন্দার মধ্যে ৭০ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক শিশু–শ্রমিক রয়েছে। কোন চাকরির নিরাপত্তা ছাড়াই এরা খুব অল্প মাইনেতে কাজ করে। এমনকী এদের মাইনে কারখানাগুলির কাছে বাকি পড়ে থাকে। শেনঝেন সহ গুয়াঙদঙ প্রদেশে শিল্পে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। পরিস্থিতি এমনই যে, কোন স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা সত্ত্বেও (সরকারি ইউনিয়ন আছে) আচমকা বেআইনি ধর্মঘটের সংখ্যাও বছর বছর বেড়ে চলেছে। একই সঙ্গে শেনঝেনে বেড়েছে অপরাধের ঘটনা।

চীনের দক্ষিণ উপকূলভাগে শেনঝেন শহর; পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের উপকূলভাগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ফলতা ব্লক। শেনঝেন এবং ফলতায় এসইজেড গড়ে ওঠার পিছনে যেমন একই ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের দিকটি রয়েছে, আবার দু'জায়গাতেই সরকারে 'কমিউনিস্ট' দলের উপস্থিতি রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই 'জোন' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া প্রায় একই সময়ে শুরু হয়েছে। যদিও ফলতায় জোন গড়ে তোলার পিছনে আনুষ্ঠানিক মূল ভূমিকা নিয়েছিল ভারত সরকার। পরবর্তীতে যখন এটা এসইজেডে রূপান্তরিত হল, তখন এসইজেড নিয়ে — সিপিআই ও সিপিএম — দুই কমিউনিস্ট দলের নীতিগত নানা সমালোচনাও ছিল। কিন্তু শেনঝেন ও ফলতার নানান মিলের দিকটি সবটাই আপতিক নয়। উভয়ক্ষেত্রেই সবকিছুর অলক্ষ্যে পুঁজির বিশ্বমনের গতিবিধি লক্ষ্যণীয়।

যেমন, ১৯৯৫ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এশিয়ায় ইপিজেডগুলিতে শ্রমিকদের ৭০–৮০% মহিলা, কোন কোন জোনে তা

৯০%। এদের বয়স ১৬ থেকে ২৫। ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন্‌স ২০০৩ সালে জানাচ্ছে, 'মেয়েরা সুশৃঙ্খল, খুঁটিনাটি ব্যাপারে অতি-সতর্ক এবং ছেলেদের চেয়ে মানিয়ে চলতে জানে বলে চট করে ইউনিয়নে যোগ দেয় না এবং সেই কারণে বিবেকহীন মালিকদের কাছে ঈশ্বরপ্রেরিত। আর তারা যুবতী, একা এবং বাচ্চা নেই এমন মেয়েদের পছন্দ করে।' ফলতাতেও আমরা একই ছবি দেখতে পাই। এখানে মালিক বা তার কন্ট্রাক্টরের মধ্য দিয়ে পুঁজির বিশ্বমন যেন কাজ করে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফলতার প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ইউনিটগুলোর কথা বলা যেতে পারে। ২৬ নভেম্বর মাঝরাতে সেখানকার প্লাস্টন পলিমার প্রাইভেট লিমিটেডে আগুন লেগেছিল। তিনদিন লেগেছে সেই আগুন নেভাতে। ওই কোম্পানির ছ'টা ইউনিট পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। খবরের কাগজে যতটুকু খবর বেরিয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে, এই ইউনিটগুলোতে কোন আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নেই। ফলতা এসইজেডেও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে এই কোম্পানিতেই আগুন লেগেছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ফলতা এসইজেডে যায় এবং ওই কমিটির চেয়ারম্যান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমাদের রিপোর্টে আমরা সুপারিশ করব যে ফলতায় এবং রাজ্যে যেসব এসইজেড হবে সর্বত্র বিপর্যয় রোধ করার এবং উপযুক্ত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।' দু'বছর গেছে, কিছুই করা হয়নি। এবছর জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক ফলতা এসইজেডের অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থার জন্য ৪২.১৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে, সেই প্রকল্প ২০১০-এর ৩১ মার্চ শেষ হওয়ার কথা। আপাতত, ওই কোম্পানির ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০০৭ সালে আমরা জেনেছিলাম, আগুন লাগায় ২৩০০ শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়েছিল, এখন এরকম ৬০০০ শ্রমিকের কথা জানা গেছে। আরও জানা গেছে, এই প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ইউনিটগুলোর ৯৯% মহিলা শ্রমিক।

মেয়েরা এগুলোকে বলে ক্যাচড়া কোম্পানি। ক্যাচড়া মানে আবর্জনা, বিদেশ থেকে বর্জিত প্লাস্টিক যাবতীয় আবর্জনা সমেত এখানে আনা হয়। মেয়েরা খালিহাতে এগুলো পরিষ্কার করে। তারপর ছেলেরা এই প্লাস্টিক থেকে মেশিনে দানা তৈরি করে। কয়েকমাস আগে ফলতা এসইজেডের কাছে জালালপুর গ্রামে গিয়েছিলাম। সুমিতা মিশ্র নামে একজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি ক্যাচড়া কোম্পানিতে কাজ করেন। তবে সেইসময় তাঁর কাজ ছিল না। ক'মাস আগে সুমিতার স্বামী মারা গেছে, ঘরে তিনটে বাচ্চা। ক্যাচড়া কোম্পানিতে পেতেন আটষট্টি টাকা রোজ। ঘন্টাখানেক হেঁটে প্রতিদিন সকাল ছ'টায় এসইজেড ১নং সেক্টরের গেটে গিয়ে তিনি ফিরে আসছেন। অগত্যা পাড়ার কাছেই একজনের বাগানে ৪০ টাকা রোজে খাটছেন। তাঁর বড়োছেলে ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে ক্যাচড়া কোম্পানিতেই মেশিনে কাজ করে। তাকেও তখন কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কাজ করে সে পেত আশি টাকা। পথে জালালপুরের পর কাশীপুরের রাস্তায় দেখলাম মেয়েরা ডিউটি সেরে হাতে থলিতে টিফিন কৌটো ঝুলিয়ে হনহন করে ঘরে ফিরছে। এত অল্প রোজগার যে বাসে চড়ে ডিউটি যাওয়া সম্ভব নয়। আর কিছু কিনে খাওয়া সম্ভব নয় বলে সঙ্গে ভাত নিয়ে মেয়েরা ডিউটি যায়।[১]

এসইজেডে মহিলা শ্রমিকদের কেন বেশি দেখা যায়? কারণটা পরিবার থেকেই আন্দাজ করা যায়। ঘরে ধোওয়া-মোছা অথবা বাচ্চা-বুড়োর গু-মুত সাফ করার কাজটা সাধারণত মেয়েরাই সামলায়। ফ্যাকট্রিতেও এরকম নোংরা কাজে মেয়েদেরই দরকার। এছাড়া, সরকারি ন্যূনতম মজুরি তো দূরস্থান, ছেলেদের থেকেও কম মজুরিতে এবং কন্ট্রাক্টর-সুপারভাইজারদের সমস্ত অত্যাচার-অপমান মুখ বুজে সহ্য করার ক্ষমতা মেয়েদের বেশি বলেই মনে করা হয়। কারণ ঘরে রয়েছে আরও কতগুলো পেট, সেগুলো ভরানোর দায় থেকেই তারা ফ্যাকট্রিতে এসেছে। এখানে মেয়েরা একটা বর্গ এবং শ্রেণীও বটে — সব মিলিয়ে একটা সমাজ। এই মেয়েরা অধিকাংশই আসছে নিম্নবর্গ পরিবার থেকে। যেমন, সুমিতা মিশ্র বিয়ের আগে ছিলেন তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। বিয়ে হয়েছিল অবাঙালি এক মজুরের সঙ্গে। স্বামী মারা যাওয়ার পর ভিটেটাও ছাড়তে হয়েছে। উপায় না দেখে ক্রিশ্চান ধর্ম নিয়েছেন তিনি, বদলে পেয়েছেন তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই।

পুঁজির বিশ্বমন এই সুমিতাদের রেডিমেড পেয়ে গেছে। এদের পাওয়া গেছে চীনে, কোরিয়ায়, বাংলাদেশে, ভারতের উপকূলবর্তী কান্দলা বা ফলতায়। শেনঝেনের মানুষ এসইজেড হওয়ার আগে কাজের জন্য চলে যেত হঙকঙে। এখন হঙকঙ পুঁজি নিয়ে হাজির হয়েছে শেনঝেনে। হঙকঙ বা তাইওয়ান মানে একটু আগেভাগে তৈরি হয়ে যাওয়া পুঁজির বিশ্বমন। সে পথ দেখিয়েছে কান্দলা, ফলতা, সান্তাক্রুজকে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এবং তার লাগোয়া কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বিড়লাপুর, বজবজ, বাটানগর, মহেশতলা, মেটিয়াব্রুজ-গার্ডেনরীচ, তারাতলা, হাইড রোড — এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আধুনিক কল-কারখানার পত্তন হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই। এখানে গড়ে উঠেছিল কারখানাগুলির কর্মকাণ্ড ঘিরে বহু শ্রমিকাঞ্চল। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নেরও গোড়াপত্তন হয় এখানে। কমিউনিস্ট পার্টিও এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড থেকে শক্তি সঞ্চয় করে বেড়ে ওঠে। আধুনিক কারখানাগুলির মধ্যে প্রথম যুগে পাটকল, সুতাকল এবং পরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ব্যাপকতা দেখা দেয়। কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের সাধারণভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। ছোটো কারখানা বড়ো কারখানার ভেদাভেদ তো ছিলই। আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে একই কারখানার গণ্ডির মধ্যে ভাগা, বদলি, ক্যাজুয়াল, ঠিকা ইত্যাদি নানান শ্রমপ্রথা। এই নানান স্তরে বিভক্ত শ্রমিকেরা মজুরি, সম্মান ও অধিকারের দিক থেকে ছিল আলাদা। মজুরি, কাজের শর্ত, ট্রেড ইউনিয়ন, ঠিকা প্রথা নিয়ন্ত্রণ ও বাতিলের আইন থাকলেও শ্রমিকেরা সেগুলি ব্যবহার করে নিজেদের বিভেদের প্রশ্নের সমাধান করতে পারেনি। ১৯৭০-এর দশক থেকে শুরু হয় লকআউট, লেঅফ বা ক্লোজার ঘোষণা করে দীর্ঘকাল কারখানা বন্ধ করে রাখার রেওয়াজ। এর বিরুদ্ধেও ট্রেড

ওভারটাইম করতেই হবে, কিন্তু ওভারটাইম হিসেবে বেতন দেওয়া হয় না। অন্যদিকে, মালিক একতরফাভাবে হাই প্রোডাকশন টার্গেট স্থির করলে শ্রমিকেরা তা পূরণ না করতে পারলে বেতন কেটে নেওয়া হয়। সেফটি ইকুইপমেন্ট/পোষাক দেওয়া হয় না। কারণ তাতে উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাবে এবং কাজের গতি ও পরিমাণ কমে যাবে। মেয়েদের নাইট শিফ্‌টে কাজ করতে হয়, অথচ তাদের ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় না। তাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা দেওয়া হয় না। বরং তারা গর্ভবতী হলে কাজ থেকে ছুটি করে দেওয়া হয়। তাদের বাচ্চাদের রাখার ব্যবস্থা নেই। যুবতী এবং অবিবাহিত মেয়েদের পছন্দ করা হয়। টয়লেট ব্যবহার করার জন্য টোকেন নিতে হয়। যৌন নিপীড়নও বেশ চলে।' ফলতার অভিজ্ঞতা আলাদা কিছু নয়।

[১] ২০০২ সালে সিআইটিইউ আয়োজিত ইপিজেড/এসইজেড নিয়ে এক সর্বভারতীয় কনভেনশনে শ্রমিকেরা রিপোর্ট করে, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, পে-স্লিপ দেওয়া হয় না। নিম্নতম মজুরি লাগু হয় না। শ্রমিকদের ঠিকাপ্রথায় খাটানো হয়।

ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের গ্রামের ভিটেমাটির সংযোগ রেখে নিজেদের এই কর্মহীন অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছে। এছাড়া, বহু বড়ো বড়ো কারখানায় শুরু হয়েছিল ফার্মিং আউট, অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন অংশ কারখানার বাইরে ভাগ ভাগ করে করিয়ে নেওয়ার প্রথা। এটা আশির দশকে বিপুল আকার নেয়। একই সঙ্গে আসে বেশ কিছুটা মেকানাইজেশন বা উন্নততর প্রযুক্তি, তা প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিক সংকোচন করতে সাহায্য করে। এর সামগ্রিক ফলাফল দাঁড়াল, সংগঠিত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক পরিবারগুলির ফের অসংগঠিত শিল্পের কাজেকর্মে ফিরে যাওয়া।

এই পটভূমিতেই ১৯৮৪–৮৫ সালে ফলতার জোনের আবির্ভাব। একদিকে তখন শ্রমজীবীদের মধ্যে নড়বড়ে বিভক্ত ট্রেড ইউনিয়ন, মজুরির ক্ষয়, কাজ হারানোর টাটকা অভিজ্ঞতা; অন্যদিকে ফলতায় চাষ, মাছধরা, ঘর ছাওয়া, কাপড় বোনা বা চর্মকারের পুরুষানুক্রমিক পেশাও সংকটগ্রস্ত। ১৯৬০–এর দশকে এখানে সেচের অভাবে বছরে একটার বেশি ধান রোয়া যেত না। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সেচের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য এখানে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী কে এল রাওকে নিয়ে আসা হয়েছিল। আগে জুটমিলে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে আসত বিহার–উত্তরপ্রদেশের মানুষ। পরে এইসব এলাকার বাঙালিরাও অনেকে ওইসব কঠিন পরিশ্রমে রাজি হয়ে গেল। বহু গ্রামবাসীকে অভাবের তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সম্প্রতি কলাতলাহাট অঞ্চলের গ্রামে গিয়ে শুনেছি, গ্রামের সমর্থ পুরুষেরা আগে কাজের জন্য দূর–দূরান্তে অন্য রাজ্যেও চলে যেত। ফলতায় জোন হওয়ার পর স্থানীয় গরিব মানুষ যা হোক কিছু রোজগারের অবলম্বন পেয়েছে। স্বামী একা রোজগার করে সংসার টানতে না পারলেও বৌ আর ছেলেমেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে সামাল দিচ্ছে। কেননা চাষের কাজ যা রয়েছে, মাঠে ফসল রোয়া আর তোলার সময় যতটুকু কাজ জোটে, তাতে মজুর খেটে বছরের অধিকাংশ সময়টাই চলে না।

ফলতা এসইজেডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রয়েছে, এখানে ২৫৩ একর ঘেরা (আরও ২৭ একর এখনও হাতে রয়েছে) চারটি সেক্টরে ১০১টি ইউনিট রয়েছে। আরও ৩০টি ইউনিট তৈরি হতে চলেছে। এর মধ্যে শিল্পগত ভাগ অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং ১২টি, ইলেকট্রনিক্স ২টি, কেমিকাল ও পেট্রোকেমিকাল্স ৬টি, লেদার ও স্পোর্ট্স ৪টি, জেম্স ও জুয়েলারি ২টি, ফুড ও অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস ৭টি, অন্য ২৫টি ছাড়া সবচেয়ে বেশি রয়েছে টেক্সটাইল ইউনিট — ৩০টি এবং প্লাস্টিক, রাবার ও সিনথেটিক ১৩টি ইউনিট। এখানে আমদানি হয় মূলত চীন, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালি ও ব্রিটেন থেকে; এখান থেকে রপ্তানি হয় মূলত মালয়েসিয়া, হঙকঙ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, আমেরিকা, কাজাখস্তান, ফ্রান্স, ইতালি ও সিঙ্গাপুরে। স্থায়ী কর্মীসংখ্যা মোট ৩৮৮১ জন, ঠিকাশ্রমিক ৪০০০, যার মধ্যে প্রায় ৬০% মহিলা।

যদিও এই হিসেব যাচাই করার কোন ব্যবস্থা ফলতায় নেই। কোনও এসইজেডেই তা থাকে না। নইলে বাইরের সমাজ ও জনজীবন থেকে কাঁটাতার আর উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখার মানে কী? এসইজেড হল শ্রমিকের এক বিচিত্র বন্দীদশা। পুঁজি আর শ্রমের পারস্পরিক লড়াই ও সম্পর্কের জের ধরেই শ্রমিক এই বন্দীদশা উপহার পেয়েছে। শ্রমিকের ইতিহাসের সঙ্গে যে শৃঙ্খলের প্রসঙ্গ যুক্ত, তারই হালফিল রূপ এই বন্দীদশা। চীনে শেনঝেন এবং ঝুহাই থেকে একটা মডেল তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। দেঙ শিয়াও পিঙ ১৯৮৫ সালে বলেছিলেন, 'শেনঝেন এসইজেড একটা এক্সপেরিমেন্ট'। এতে বিদেশের মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কে জানে, চীন হয়ত পুরনো গোঁড়ামি ছাড়বে না। দেঙ উত্তর দিয়েছিলেন, 'বহির্বিশ্বের কাছে খুলে দেওয়ার গোটা নীতি একটা এক্সপেরিমেন্ট ... তা অপরিবর্তিত থাকবে'। সেটাই সত্যি হয়েছে। প্রথমে একটা পাঁচিল তোলা হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে, কিংবা কোথাওবা একটা শহর ঘিরে। সেখানে কোন মহিলা শ্রমিক হাজার লাঞ্ছনা আর অপমানেও চেঁচাতে পারত না। কারণ আওয়াজটা বাইরে পৌঁছাত না। কিন্তু তাকে স্বেচ্ছায় ফিরে আসতে হত সেই অপমানের চার দেওয়ালের মধ্যে। ফলতায় একজন শ্রমিক কারখানায় কাজ করতে করতে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। কারখানা–কর্তৃপক্ষ, থানা বা পঞ্চায়েত কোথাও কোন প্রশ্ন তোলা যায়নি তা নিয়ে। তাঁর স্ত্রী দুটো মেয়েকে খাওয়াতে ফের ঢুকেছিল জোনে এবং ক্যাচড়া কোম্পানিতেই।

অর্থাৎ এসইজেড একটা প্রক্রিয়া; পুঁজির তরফে শ্রমিককে নিংড়ে নেওয়ার একটা নতুন পর্যায়। এই প্রক্রিয়ায় গোটা চীনই আজ একটা জোনে রূপান্তরিত হয়েছে। নানান ধরনের জোন আজ চীন জুড়ে। ১৯৯২–৯৩ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, চীনে মোট প্রায় ১৫০০০ বর্গকিমি এলাকা নিয়ে ৬০০০ থেকে ৮৭০০ নানান ধরনের জোন; ১৯৮৭ সালের 'ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ল'–এর সুযোগ নিয়ে রিয়েল এস্টেট ডেভলপাররা প্রায় ১২৭০০০ হেক্টর জমির ছাড়পত্র পেয়েছে, অথচ তার মাত্র ৪৬.৫% তারা ডেভলপ করেছে।

২০০৫ সালের ১০ মে ভারতীয় পার্লামেন্টে যখন এসইজেড বিল উত্থাপিত হয়, সাংসদ এম রামদাস বলেছিলেন, 'এসইজেডের মধ্যে দিয়ে উন্নতি করেছে এমন দেশ হিসেবে চীন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ...' মাত্র দু'ঘন্টার আলোচনায় অধিকাংশ সাংসদের অনুপস্থিতিতে ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে যায় এসইজেড বিল। বামপন্থীরাও বিলের দুটি পয়েন্টের বিরোধিতা ছাড়া গোটা বিলকে নাকচ করেনি। কারণ ২৫ বছর আগেও 'পশ্চাদপদ' ফলতাকে 'শিল্পোন্নত' করার দিল্লির ফর্মুলাকে তারা নাকচ করেনি। আজও 'উন্নয়ন' ও 'শিল্পায়ন'–এর এই মডেলেই তাদের আস্থা অটুট।

সূত্র :

১. Declassified documents of Nixon trip to China, The National Security Archive, 11 December 2003
২. In the name of growth: The Politics and the Economics of India's Special Economic Zones, Shankar Gopalkrishnan, April 2007
৩. Fundamental Issues in Present-day China, Deng Xiaoping, 1982-87

জন-বিবেচনায় মহারাষ্ট্রের এসইজেড

ভূমিকা

স্পেশাল ইকনমিক জোন অ্যাক্ট বা এসইজেড আইন হয়েছে ২০০৫ সালে। তখন থেকে এদেশে ১০৪৬টি এসইজেড সরকারি অনুমোদনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এই দ্রুত অনুমোদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত মালিকদের কাছ থেকে 'জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪' কিংবা রাজ্যভিত্তিক ওইধরনের আইন মারফত নেওয়া হচ্ছে। শিল্পস্থাপনের যুক্তিতে চাষের জমি এবং সমষ্টিগত সামাজিক ব্যবহারের জমি অধিগ্রহণ দেশজুড়ে প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছে।

এই পটভূমিতেই বিভিন্ন রাজ্যের আন্দোলনকারী সংগঠন, কর্মী এবং গবেষকেরা একটি 'পিপল্‌স অডিট' অর্থাৎ জনসাধারণের দিক থেকে এসইজেডের মূল্যায়ণের কর্মসূচি নিয়েছে। মহারাষ্ট্রে এই অডিট হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, রায়গড় জেলার পেন তালুকের দিভ গ্রামে। মহারাষ্ট্রেই রয়েছে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক এসইজেড, ইতিমধ্যে ২০৪টি অনুমোদন পেয়েছে। এই জন-বিবেচনার আওতায় এসেছে রায়গড়, নাসিক, নাগপুর, অমরাবতী, পুনে এবং মুম্বাই-থানে জেলা। ১০টি এসইজেডের বৃত্তান্ত এই অডিটে পেশ করা হয়েছে। এই অডিটের সারাংশ-প্রতিবেদন সংকলিত করেছেন সুমন্যা ভেলামুর। বিস্তারিত সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটিও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সারাংশ-প্রতিবেদনটি কিছুটা সম্পাদনা করে বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশ করছি। সম্পাদনা ও তর্জমা করেছেন জিতেন নন্দী।

জেলাগুলির অবস্থা

রায়গড় : উপকূলবর্তী এই অঞ্চলটি মহারাষ্ট্রের চাল উৎপাদনের জন্য সকলের কাছে পরিচিত। নানান ধরনের সবজি এবং ফল এখানে উৎপন্ন হয়। এখানকার কৃষিজীবী মানুষ মাছ ধরা, পোলট্রি ও পশুপালনও করে থাকে। এছাড়া এখানে লবণ তৈরি করেও বহু মানুষ বেঁচে থাকে। অঞ্চলটি মুম্বাইয়ের কাছে এবং রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ ভালোই। এখানকার ১৪,০০০ হেক্টর নিয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের 'মহামুম্বাই এসইজেড' গড়ার কথা ভাবা হয়েছিল। এই এলাকার মধ্যে রয়েছে ৪৫টি গ্রাম এবং তার ১১,৬৯৬ হেক্টর চাষের জমি ও বসতি এলাকা। ৪৫টির মধ্যে পেন তালুকে ২৪টি, উরানে ২০ এবং পানভেলে ১টি গ্রাম পড়েছে। যখন এসইজেডের জন্য সরকার ৫০০০ হেক্টরের উর্ধসীমা ঘোষণা করল, তখন এই এসইজেডের জন্য নীতিগত-অনুমোদন কমিয়ে ৫০০০ হেক্টর করা হল। কিন্তু সরকার বা ডেভলপার কেউই বলল না, সংশোধিত এলাকাটা কী দাঁড়াল বা কোন কোন গ্রাম এখন ওই ৫০০০ হেক্টরের মধ্যে পড়ছে। জমি অধিগ্রহণের নোটিশও ৪৫টি গ্রামেই বহাল থাকল।

রায়গড়ে আলিবাগের শাহপুর-ধেরান অঞ্চলে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের আর একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন এসইজেড হওয়ার কথা। অবশ্য এই দুটি এসইজেডের জমি অধিগ্রহণের সময়সীমা পেরিয়ে গেছে এবং সময় বাড়ানোর আবেদন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে নাকচ হয়ে গেছে।

নাসিক : মুম্বাই থেকে ১৮৫ কিমি এবং পুনে থেকে ২০২ কিমি দূরে নাসিককে শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত অঞ্চল মনে করা হয়েছে। এখানকার সিন্নার তালুকের জমি সেচযুক্ত সমৃদ্ধ চাষের এলাকা। এখানকার আখ চাষ থেকে স্থানীয় মানুষ অনেকটা আয় করে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিন্নার তালুকের প্রায় ২৭০০ হেক্টর জমিকে একটি ফাইভ স্টার মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে রূপান্তর করতে চেয়েছে। এই এস্টেটের অংশ হিসেবেই 'ইন্ডিয়া বুল্‌স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এসইজেড' ১০২৩.৪৩ হেক্টর মাল্টি-প্রোডাক্ট এসইজেড গড়ার প্রাথমিক নীতিগত (ইন-প্রিন্সিপ্‌ল) অনুমোদন পেয়েছে।

অমরাবতী : নাগপুরের কাছে মহারাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলা অমরাবতী। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলের অংশ এই জেলায় গম, মটর, জোয়ার, তিল ও সূর্যমুখীর চাষ হয়। এছাড়া তুলা, কমলালেবু, চিনাবাদাম ও সয়াবিনের মতো অর্থকরী ফসলও এখানে উৎপন্ন হয়। অমরাবতীর ৬৫.৭% চাষের জমি। নন্দগাঁও-পেঠ অঞ্চল একটি 'ফাইভ স্টার' ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই অঞ্চল 'মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' MIDC-র কাছ থেকে ১৫ বছরের জন্য বিদ্যুৎ শুল্ক থেকে ১০০% ছাড় পাবে। ২০০২ সালে এর কিছুটা জমি কেমিকাল হাবের জন্য MIDC অধিগ্রহণ করেছে। ২০০৬ সালে মাল্টি-প্রোডাক্ট এসইজেড তৈরির জন্য নন্দগাঁও-পেঠে ১০১০ হেক্টর জমির অনুমোদন পেয়েছে।

নাগপুর : অমরাবতীর পূর্বদিকে মহারাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের জেলা নাগপুর। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলের এই জেলার ৯,৮৬,৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৬,৪০,৭৭৫ হেক্টর চাষের জমি। এখানে ধান, আখ, গম, জোয়ার, রকমারি ডাল, সয়াবিন, চিনাবাদাম, তিল এবং অর্থকরী ফসলের মধ্যে তুলা ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। এখানে মানুষ চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা পেশায় যুক্ত। মিহান অঞ্চলে ডেয়ারি শিল্প বেড়ে উঠছে। 'মহারাষ্ট্র এয়ারপোর্ট ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' এখানে মিহান এসইজেড গড়ার জন্য ১৫১১ হেক্টর জমির অনুমোদন পেয়েছে।

পুনে : মুম্বাই থেকে ১৮০ কিমি দূরত্বে মহারাষ্ট্রের কোঙ্কান অঞ্চলে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলা পুনে। এখানে ধান, নাচানি, জোয়ার, বাজরা, গম, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম ও আখ উৎপন্ন হয়। এখানকার চারটি এসইজেড — ১০০০ হেক্টর নিয়ে ভিডিওকন রিয়ালটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাল্টি-প্রোডাক্ট এসইজেড, ৩১.৪৯ হেক্টর নিয়ে রাজিব গান্ধী ইনফোটেক পার্ক, ১০৮৫ হেক্টর নিয়ে ভারত ফোর্জ মাল্টি-প্রোডাক্ট এসইজেড এবং ১০০০ হেক্টর নিয়ে মাহিন্দ্র রিয়ালটি ডেভলপার্স মাল্টি-প্রোডাক্ট এসইজেড — পিপল্‌স অডিটের আওতায় এসেছে। কৃষিজীবী ছাড়াও ফিশারি, ডেয়ারি ও পোলট্রির সঙ্গে যুক্ত মানুষ এর দ্বারা বিপর্যস্ত হবে।

মুম্বাই-থানে : গোরাই, মানোরি ও উথান গ্রাম এবং ধারাভি আইল্যান্ড অঞ্চলের মধ্যেকার পার্শবর্তী গ্রামগুলি মুম্বাই সুবার্বন এবং থানে উভয় জেলার মধ্যেই পড়ছে। এখানে একটা পুরনো মৎস্যজীবী সমাজ রয়েছে। এরা ধান ও শাকসবজিও ফলায়। এখানে বেশ গভীর বাদাবন রয়েছে। বহু মানুষ এখানে লবণ তৈরির সঙ্গে যুক্ত। মুম্বাই শহরের কাছে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও মনোরম। এই দ্বীপে প্যানইন্ডিয়া পারিয়াতন কোম্পানি লিমিটেড একটি মাল্টি-সার্ভিস এসইজেড গড়ার অনুমোদন পেয়েছে। দশটি গ্রাম এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রথমে এসেল ওয়ার্ল্ড-এর এসইজেডের জন্য ৫৪৭০ হেক্টর নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। জনপ্রতিরোধে জমির পরিমাণ কমিয়ে ১১০ হেক্টর করা হয়। এটাই এখন ইন-প্রিন্সিপল অনুমোদন। এর বেশিরভাগটাই বাদাবন।

শুনানির বিবরণ

শুনানি থেকে জানা যায়, অডিটের আওতায় আসা এসইজেডগুলির জমি অনেকটাই চাষযোগ্য এবং উৎপাদনশীল। মুম্বাই, থানে, রায়গড় ও পুনে

সমেত কোঙ্কান অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি। ফলে ধানচাষের পক্ষে তা খুবই উপযুক্ত। চাষিদের সরাসরি বক্তব্য থেকে জানা গেছে, এসইজেডের জন্য অধিগৃহীত হবে এমন জমির অনেকটাই খুব উর্বর এবং ফলনশীল।

প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজের কাছ থেকে কর্পোরেটদের দখলে যাচ্ছে

রায়গড়ের অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর অফ টাউন প্ল্যানিং জানান, রায়গড়ের পেন তালুকের ২২টি গ্রামকে গ্রিন জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এই গ্রিন জোনে চাষের কাজ ছাড়া একমাত্র এয়ারপোর্ট নির্মাণ হতে পারে। এটা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, এখানে শিল্প বা এসইজেড হতে পারে না। অথচ মহামুম্বাই এসইজেডের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে এই ২২টি গ্রাম। এই গ্রিন জোন আবার সেচ দপ্তরের অধীনে ৫৫টি গ্রাম নিয়ে হেতাভনে মিডিয়াম ইরিগেশন প্রজেক্টের আওতায় পড়ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখানে চাষের সেচের জন্য প্রচুর জল সরবরাহ হবে। এসইজেড হলে সেই জল সেখানে ব্যবহৃত হবে।

একইভাবে সিন্নার ও নাসিকের জমিতে স্থানীয় চাষিরা মহারাষ্ট্র সরকারের 'আদর্শ গ্রাম যোজনা'–র মাধ্যমে ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা করেছে। এখানকার নদী, কুয়ো এবং পুকুরগুলো সেচের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে চাষিরা ধারকর্জ করে জলাধার, পাইপলাইন বসিয়ে মাঠে চাষের জল নিয়ে আসে। এসইজেড হলে এই জলসম্পদ কর্পোরেটদের মুনাফাবৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হবে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, উৎকৃষ্ট চাষের জমি এসইজেডের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে না। অন্যদিকে সরকার বলছে, রায়গড়ের জমি পতিত এবং অনাবাদী। শুনানিতে জানা যায়, এই জমিগুলোতে গরু–ছাগল চরানো হয়, পুকুর খুঁড়ে মাছচাষও হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র নয়ছয় করে দেখানো হচ্ছে যে, জমি চাষের উপযুক্ত নয়।

রায়গড়ের গাঁওথান (গ্রামের বসতি এলাকা) অধিগ্রহণের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ ফুট নিচে। যদি আশপাশের এলাকাকে ডেভলপ করে নগরায়ন করা হয়, তাহলে এই বসতি এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। ডেভলপার যে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্যাকেজ স্থির করেছে, তার মধ্যে এই এলাকার বাসিন্দাদের ধরা হয়নি।

পরিবেশগত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, জলসম্পদ কর্পোরেটদের দখলে গেলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাবে; শিল্পগত উৎপাদনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের আদ্রতার ওপর নির্ভরশীল রবিশষ্যের ক্ষতি হবে। নাসিক জেলার সরকারি ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, শিল্পায়ন ও দ্রুত বন ধ্বংসের ফলে উদ্বেগজনকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে।

সিদ্ধান্তগ্রহণের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

রায়গড় জেলায় মহামুম্বাই এসইজেডের জন্য ২০০৬ সালে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয় 'জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪'–এর ৪ নং ধারাতে। ওই আইনের ৬ নং ধারাতে ২০০০০ চাষি ও জমির মালিকেরা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসারের কাছে তাদের আপত্তির কথা জানায়। হেতাভনে সেচ প্রকল্পের আওতায় থাকা ২২টি গ্রামের চাষিরা ওই এলাকাকে এসইজেডের মধ্যে না রাখার দাবি জানায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ওই এলাকার জমি ডিনোটিফাই করার আগে জনমত যাচাই করা হবে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ জেলা কালেক্টর একটি গণভোট নেন। ১৫ দিনের মধ্যে তার ফল ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার তার খেলাপ করে। 'জাগতিকরণ বিরোধী কৃতি সমিতি' এই গণভোটের ফল ঘোষণা করে। তাতে জানা যায়, ৯৫% চাষি এসইজেডের জন্য জমি দিতে নারাজ।

অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত রায়গড়ের ৪৫টি গ্রাম রয়েছে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। এই ১২টি পঞ্চায়েত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখানকার জমি এসইজেডের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে না। এই সিদ্ধান্ত ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার, জেলা কালেক্টর এবং মহারাষ্ট্র সরকারকে জানানো হয়েছে। রায়গড়ের জেলা পরিষদও একই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সরকার এবং দিল্লিতে এসইজেডের বোর্ড অফ অ্যাপ্রুভাল–এর কাছে পাঠিয়েছে। এই সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি পর্যন্ত তারা দেয়নি।

এছাড়া, রায়গড়ে এসইজেডের ডেভলপার এজেন্ট নিয়োগ করে চাষিদেরকে জমি দিতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছে। এমনকী, জমির মালিকের অজ্ঞাতসারে কিছু জমি কিনে নেওয়াও হয়েছে। এই লেনদেনের জন্য ভোটার আইডেনটিটি কার্ড পর্যন্ত জাল করা হয়েছে। শুনানিতে এইসব তথ্য উঠে এসেছে।

সভ্যতা নিয়ে জন জের্জেনের বিচারমূলক আলোচনা

৪ ডিসেম্বর ২০০৯ বিকেল ৫.৩০টায় র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাঘরে জন জের্জেন তাঁর ভাবনার কথা কলকাতার কিছু মানুষের কাছে পেশ করেন। তিনি কলকাতায় মোট তিনটি ছোটো সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দিল্লি এবং অন্যত্রও তিনি আলোচনা করেছেন।

উন্নয়নের কথা একসময়ে সাধারণ সত্য হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। আজ এই সাধারণ সত্যকে নিয়ে তর্ক উঠেছে, প্রতিবাদ হচ্ছে। সারা বিশ্ব জুড়ে এই যে প্রতর্ক, তা অনেক মাত্রাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনেক সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যে 'সভ্যতা' (Civilization)–কে উন্নয়নের প্রক্রিয়া ধারণ করে, সেই 'সভ্যতা'–ও এই প্রতর্কের মধ্যে চলে এসেছে। সভ্যতা সম্পর্কে মুগ্ধতা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন।

জন জের্জেন হলেন সেইসব মানুষেরই একজন, যারা শুধুমাত্র উন্নয়ন নয়, সভ্যতার নানা অবদানকে — যা সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়, প্রতিদিনের ভাবনায়, যেমন ভাষা, বিমূর্ত শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদিকে — অন্য মাত্রা দিয়ে বিচার করে চলেছে, প্রশ্ন তুলেছে, বিরোধ রেখেছে।

*জন জের্জেন, জন্ম ১৯৪৩ সালে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে গণ আন্দোলনে তিনি শামিল হন এবং কারারুদ্ধ হন। যদিও ১৯৬০ সালে সানফ্রান্সিসকোয় সোশাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে কাজ করার সময় সেখানকার শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। ইউনিয়নের 'র‍্যাডিকাল' লিডারের ভূমিকা থেকে ক্রমশই তিনি নৈরাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 5th Estate Anarchy পত্রিকার সাথে একজন নৈরাজ্যবাদী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। আশির দশক থেকে প্রযুক্তির নিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন। জন জের্জেনের রচিত প্রধান বইগুলি হল : **Elements of Refusal (1999), Future Primitive and other essays (1994), Running on Emptiness (2002), Twilight of the Machines (2008); সম্পাদনা করেছেন Against Civilization:Readings and Reflections (2005)***

আমরা চাই আমাদের পাঠকেরা তাঁদের উপলব্ধি থেকে এই ভাবনাকে বিচার করবেন এবং একটি সংলাপ গড়ে তুলবেন। জের্জেনের বক্তব্যকে বাংলায় তর্জমা করেছেন শমীক সরকার ও রঘু জানা। নোট তৈরি করেছেন যোগীন সেনগুপ্ত।

আপনাদের ধন্যবাদ, আমার মতো একজন আমেরিকা–বিরোধী আমেরিকানকে ডাকার জন্য। আমার অনুভূতি হচ্ছে, আমি একলা নই। যারা চালু আদর্শগুলি এবং পদ্ধতিগুলির (approaches) প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে, তাদের আমি একজন।

আজ যখন আধুনিকতা ভেঙে পড়ছে, মাস সোসাইটি (mass society) [নোট : ১] ভেঙে পড়ছে, তখন আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পারছি, চালু আদর্শগুলির থেকে অন্য কিছু ভাবা দরকার। এটা স্পষ্ট, যা চলছে তা আরো খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা নিজে থেকে শোধরাবে না যদি আমরা এটার বিরুদ্ধে অ্যাকশন না নিই। এটা বহু তথ্য থেকে স্পষ্ট, প্রজাতিগুলো শেষ হয়ে যাবার যে হার, তা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। সমুদ্র আর কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিতে পারছে না। আমরা চরম জলবায়ুর সম্মুখীন হচ্ছি। মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে। দু'দিন আগেই শুনলাম, সুন্দরবন বদ্বীপে উষ্ণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। উত্তর ভারতের ২০০০ কিমি লম্বা জায়গা জুড়ে ভূ–গর্ভস্থ জল শুকিয়ে যাচ্ছে। মুদ্রার ওপিঠ — আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনটাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। মানসিক ব্যাধি, আশঙ্কা, চাপ, আত্মহত্যার হার, এগুলি শুধু পশ্চিমী দুনিয়ায় নয়, পূর্বেও প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে মানব জীবনের প্রাথমিক কার্যকলাপগুলো, যেমন খাওয়াদাওয়া, যৌন প্রক্রিয়া, এগুলি স্বাভাবিকভাবে করতে পারছি না, আমেরিকায় কোটি কোটি লোক এগুলির জন্য ড্রাগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শহরগুলো তো সভ্যতার প্রতীক, কিন্তু শহরগুলো আর বাসযোগ্য থাকছে না, সেখানে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার দর্শনের শেষ হয়ে যাবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের শর্ত হয়ে যাচ্ছে টেকনোলজি (technology) এবং ইন্ডাস্ট্রির (industry) পৃথিবী। সবকিছু মাপা হচ্ছে, সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এবং মূল্যায়িত হচ্ছে এই নিরিখে যে সেগুলি কতটা শিল্প এবং প্রযুক্তিকে জোগান দিতে পারবে। আমাদের সমস্ত জীবনটা একটা যেন মজুতঘর, অপেক্ষা করে আছে এই শিল্প সভ্যতাকে জোগান দেওয়ার জন্য। দর্শনের শেষ বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন, টেকনিক্যাল ক্যালকুলেশন (technical calculation) চিন্তা এবং অনুসন্ধানের জায়গা নেবে। অথবা চিন্তা এবং অনুসন্ধান কোনও ব্যক্তির শখ হিসেবে থেকে যেতে পারে, কিন্তু সেগুলির সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা আর থাকবে না। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে স্বরটায় (note) উত্তর আমেরিকানরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে মনে মনে গান গায়, সেটা হচ্ছে B-natural, ওদের সারেগামার। এর কম্পাঙ্ক মিলে যায় ৫০ সাইকেল প্রতি সেকেন্ডের এসি ইলেক্ট্রিসিটির সঙ্গে। ইউরোপে লোকে G-sharp–এ স্বাভাবিক ভাবে গায়, সেটাও ওখানকার ৫০ সাইকেল প্রতি সেকেন্ডের এসি ইলেক্ট্রিসিটির সঙ্গে মিলে যায়। আমাদের সভ্যতা এতটাই গভীরভাবে শিল্পায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, যে গান আমরা স্বাভাবিকভাবে গাই তার কম্পাঙ্কটা ইলেক্ট্রিসিটির সাথে মিলে যায়। এই প্রক্রিয়াটা অনেকদিন ধরে চলছে, এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। এই আধুনিক শিল্প/প্রযুক্তি সংস্কৃতি, এটা অনিবার্য নয়। বরং এটা অনিবার্য ধরার ফলে আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আমরা বর্তমান এই টেকনোলজির বিশেষ কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। এই যে টেকনোকালচার (technoculture)–এর [নোট : ২] প্রসার পশ্চিম এবং পূর্বে ঘটেছে, তার ফলে আমাদের সুযোগ এসেছে গভীরভাবে এর মাশুলটাকে দেখার। আমরা যে এভাবে খুব একটা দেখিনি তার কারণ বোধহয় আমাদের মতাদর্শগুলো দাবি করেছে, টেকনোলজি হল নিরপেক্ষ। কিন্তু টেকনোলজি কোনদিন নিরপেক্ষ ছিল না, এখনও নয়। টেকনোলজি সমাজের সাথে মিশে ছিল। বস্তুত, টেকনোলজিই হল সমাজ। টেকনোলজির মধ্যে দিয়ে সমাজের আধিপত্যকারী পছন্দ, মূল্যগুলি (values) প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সাধারণ টুলগুলো ব্যবহার করি, [হাতুড়ি, খুন্তি ইত্যাদি] সেগুলোর মূল্যের সাথে আধুনিক, সিস্টেমেটিক (systematic) টেকনোলজির মূল্যের তুলনা করে দেখলে দেখবো, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। সাধারণ টুলগুলোর মধ্যে নিহিত আছে যে মূল্যগুলো, কার্যকারীতা, সংহতি, নমনীয়তা, সহজ অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের প্রতি অত্যন্ত কম নির্ভরতা। কিন্তু আধুনিক টেকনোলজি ব্যবস্থায় বরং বিপরীত মূল্যগুলি সমাবেশিত, যেমন অনমনীয়তা : মেশিন নিজেই ঠিক করে, তাকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে। এবং এগুলোর ব্যবহারের মধ্যে কোনও আনন্দ নেই, অনেকটাই নির্ভর করতে হয় বিশেষজ্ঞদের ওপর। আরও একটা কারণে এই টেকনোলজি নিরপেক্ষ নয় : এর উৎস আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি সংগঠন। এটা ছাড়া টেকনোলজির অস্তিত্ব নেই। আর এই ইন্ডাস্ট্রি সংগঠনের মানে হল কোটি কোটি মানুষের ইন্ডাস্ট্রিয়াল দাসত্ব, এবং কাঠামোগতভাবে প্রকৃতির ধ্বংস। এখানে মূল্যবোধ এবং পছন্দ–অপছন্দের জায়গা কিন্তু আছে, আমরা সবাই জানি ঝকঝকে সেলফোনগুলো কোথা থেকে আসে, কিন্তু আমরা বড়ো একটা তা নিয়ে চিন্তা করি না। প্রচার আছে যে আধুনিক টেকনোলজি আমাদেরকে ক্ষমতাবান করে, কিন্তু বাস্তবত ক্রমবর্ধমান টেকনোলজিক্যাল সমাজের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এটা আমাদের ক্ষমতাহীন করছে। প্রচার আছে, আধুনিক যোগাযোগের টেকনোলজি মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। অথচ বাস্তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ অনেক কমে যাচ্ছে। আমেরিকায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া কমছে। আরো বেশি বেশি করে মানুষ একলা থাকছে। দাবি করা হয়, ওয়াইরড সোসাইটি [কম্প্যুটার, ইন্টারনেটওয়ালা সমাজ : অনুবাদকের নোট] বৈচিত্র্য বাড়াবে। অথচ ভিন্নতা কমে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন [ছকবদ্ধ হয়ে যাওয়া : অনুবাদকের নোট] বাড়ছে। দাবি করা হয়, আধুনিক টেকনোলজির ফলে কাগজের ব্যবহার কমে যাবে বা থাকবেই না। কিন্তু টেকনোলজি একই সঙ্গে ফটোকপি বানিয়ে দিচ্ছে, প্রিন্টার জুড়ে দিচ্ছে কম্পিউটারের সঙ্গে, এবং তার জন্য কাগজের ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে গেছে।

কিন্তু এই টেকনোলজির উৎস অনেক প্রাচীন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন–এরও অনেক আগে, যবে থেকে সভ্যতার, ডমেস্টিকেশনের [নোট : ৩] অথবা কৃষির জন্ম হয়েছে। মানুষ যবে থেকে শৃঙ্খলার আবদ্ধে চলে এসেছে, তখন থেকে টেকনোলজির জন্ম। আমরা বলতে পারি, আজকে যে আমরা জেনেটিক টেকনোলজি, ক্লোনিং, ন্যানো–টেকনোলজি ইত্যাদি দেখছি তার সূচনা হয়েছিল যখন আমরা দশ হাজার বছর আগে ডমেস্টিকেশনের দিকে সরে এসেছিলাম। এককথায় এটা হয়েছে কৃষির আবির্ভাবের সাথে সাথে, যখন থেকে আমরা গাছ এবং পশুকে ঘরে বাঁধতে শুরু করলাম। দশ হাজার বছর আগে এই টার্নিং পয়েন্টটাকে আজকে অনেকে বলছে মানুষের ইতিহাসের সবথেকে বড়ো ভুল। এই পরিবর্তনটা হল প্রকৃতির দানে চলা সমাজে বাঁচার বদলে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার ওপর আধিপত্য করে, তাকে পদদলিত করে বাঁচা। প্রকৃতির দান আহরণ করে চলা সমাজগুলির ওপর এই ডমেস্টিকেটেড সমাজ যখন বিজয় অর্জন করল, তখন আমাদের যুক্তিপ্রক্রিয়ায় একটা পরিবর্তন ঘটে গেল, এই পরিবর্তিত যুক্তিপ্রক্রিয়ার হাত ধরেই এসেছে আজকের জেনেটিক্যালি মডিফায়েড খাবার। আজকে যে আমরা গভীরভাবে প্রকৃতিকে দমন, ধ্বংস, অদলবদল করা দেখছি, সেগুলির সূত্রপাত হয়েছে সেই সভ্যতার শুরুতে।

এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও সূত্রপাত তখন, যখন মানুষ একটা

নির্দিষ্ট জমিতে চাষবাস করতে লাগল, স্বাভাবিকভাবেই সে যেহেতু ওটাতে মেহনত দিচ্ছে, তাই একটা সম্পত্তির মনোভাবও জন্ম নিল। এখানে আমরা সিগময় ফ্রয়েডের একটা মূল্যবান বই দেখতে পারি — Civilization and Its Discontent. যেটা আশি বছর আগে তিনি লিখে গেছেন। ফ্রয়েড সভ্যতা বলতে ডমেস্টিকেশনকেই বুঝিয়েছেন, যদি তাঁর বইটা ভালো করে পড়া যায় তাহলে বোঝা যাবে, ফ্রয়েড বলেছেন ডমেস্টিকেশন যে জীবন আনল তার কথা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসা অসন্তুষ্টির কথা। আপনারা হয়ত জানেন, তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, যত বেশি আমাদের সভ্যতা এগিয়ে যাবে তত আমরা অসুখী হব। ফ্রয়েডের ওই বইয়ের এটাই মূল কথা যে নিউরোসিস (স্নায়বিক পীড়া) এবং সভ্যতা একসূত্রে বাঁধা। আশি বছর পর আমরা দেখছি সেটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। বরং ফ্রয়েডের অনুমানের তুলনায় আর একটু বেশিই বেড়েছে অসন্তুষ্টি। ফ্রয়েডের মতে মানুষকে বশ্যতার মধ্যে নিয়ে এলে, তার স্বাধীনতা কমে যায়, তার অসন্তুষ্টি বেড়ে যায়। এই মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পরেও আমরা জানি যে ফ্রয়েড জানিয়েছিলেন, ডমেস্টিকেশন ছাড়া আমরা কাজ করতে পারব না, আমরা সিম্বলিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারব না। ফ্রয়েড এই মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেও বলেছিলেন, কী আর করা যাবে, আমাদের তো চলতে হবে, কাজ করতে হবে, সংস্কৃতি নির্মাণ করতে হবে, তাই ডমেস্টিকেশন চলুক।

কিন্তু আজকে যখন আমরা এই অসুখ অনুভব করছি, তখন প্রশ্ন করতে হচ্ছে, কৌম সমাজ বা যৌথ জীবনের কী হল? পশ্চিমী দুনিয়ায় কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতারা সস্তার জনপ্রিয়তা পাবার জন্য কমিউনিটি বা কৌম সমাজ শব্দটা প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। কিন্তু এটার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আদিবাসী সমাজের ওপর যারা তত্ত্বচর্চা করছে, তারা এটা খুব স্পষ্টভাবে দেখেছে যে, আধুনিক সভ্যতা এবং আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা হল এমন ব্যবস্থা যেখানে কমিউনিটির কবর হয়। রবীন্দ্রনাথ একশ' বছর আগে বলেছিলেন যে আমাদের কৌমসমাজের নিবিড় সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে প্রতিদিন। আমরা জানি গান্ধীজিও গ্রামসমাজ, সহজ জীবনের কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে সহজ জীবন বা স্বনির্ভর গ্রাম সমাজ, কোনওটাই নেই।

[নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ব্ল্যাকবেরির পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনে হিমবাহের ছবি দেখিয়ে জের্জেন বলেন] এই বিজ্ঞাপন বলছে সেলফোন ব্যবহার করার কথা, কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউন্ডে হিমবাহের ছবি। এই হিমবাহগুলো সব গলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সেলফোন, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতার কারণেই এই হিমবাহগুলো গলে যাচ্ছে।

তাই আমাদের প্রিমিটিভিজমের দিকে ফিরতে হবে। অনুপ্রেরণা পেতে হবে সভ্যতা এবং ডমেস্টিকেশনের আগের সমাজের থেকে, যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। গত কয়েক দশকে এই আদিম সমাজ সম্পর্কে আমাদের জানাবোঝা অনেক বেড়েছে। ওই আহরণকারী সমাজের চরিত্র ছিল পরস্পরের সাথে ভাগ করে নেওয়া, সেখানে সবাই সমান ছিল। এবং এই ডমেস্টিকেটেড নয় যে সমাজ, সেখানে মানুষের মধ্যে সংগঠিত হিংসা, যুদ্ধ – এসবের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সেই সমাজে মহিলারা বস্তু হয়ে যায় নি, তাদের স্বশাসন ছিল (The condition of women in those societies was characterized by non-objectification and autonomy)। মানুষের কাজকর্ম ছিল খুব কম, খুব বেশি হলে দিনে ২–৪ ঘন্টা, তাদের জীবনধারণের জন্য। আর আজকে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। এটা ভাবার কারণ নেই যে এটা কোনও কল্পনা, এটা এখন পাঠ্যপুস্তকেও চলে এসেছে। ওই সময় মানুষের সংখ্যার সাথে প্রকৃতির একটা ভারসাম্য ছিল। অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি গত ২০ লক্ষ বছরে হয় নি, এই ভারসাম্য ভেঙে গেছে আজ দশ হাজার বছর।

আজ আমাদের প্রয়োজন সবকিছু পুনর্বিবেচনার, ভাবনার কাঠামোটাকেই বদলে ফেলার। আমার কাছে বা আমাদের কাছে চটজলদি উত্তর নেই এই সমস্যা সমাধানের। আমরা কেবল শুরু করছি। পুনর্বিবেচনা করছি। আমি নিজেও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম। মার্ক্সীয় তত্ত্বকাঠামোও এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেলের কথাই বলে, যা আমরা প্রত্যাখান করেছি। সেদিক থেকে আমাদের অবস্থানটা উত্তর–বাম, যদি না তাকে বামবিরোধী বলা হয়। আমি বামবিরোধী, কারণ কেউ কেউ মনে করে, উত্তর–বাম কথাটা একটা ধোঁয়াশা তৈরি করে।

… … …

জন জের্জেনের মূল বক্তব্য এখানেই শেষ হয়, বামবিরোধী এবং উত্তর–বাম নিয়ে সভাস্থলে কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ায় জের্জেন নৈরাজ্যবাদী রাজনীতির দুটি ধারা, বাম এবং বামবিরোধী (যে ধারার তিনি একজন) ধারার তর্ক সম্পর্কে একটা ধারণা দেন।

চিরাচরিত বাম নৈরাজ্যবাদী এবং এই সবুজ নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে একটা তর্ক চলছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সবুজ আন্দোলন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা বিরোধী আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। নৈরাজ্যবাদের মূল কথা সমাজ ও উৎপাদনের আত্মনিয়ন্ত্রণ (self management), অর্থাৎ যারা উৎপাদন করবে, তারাই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু যদি কেউ বলে, কারখানারই দরকার নেই, তখন কারখানার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটাই আসে না। এই আলোচনাটা করার জন্য অবশ্য নৈরাজ্যবাদী হবার দরকার নেই। দুটো স্লোগান লাল বা বামপন্থী নৈরাজ্যবাদীদের সামগ্রিক মুক্তির প্রকল্প প্রতিনিধিত্ব করে : রাষ্ট্রকে চূর্ণ করো এবং পুঁজিবাদকে ধ্বংস করো। আমরাও অবশ্যই এই দুটি চাই। কিন্তু যদি তুমি এই জটিল সমাজকে, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজকে জিইয়ে রাখতে চাও, তবে তুমি কখনই রাষ্ট্রকে শেষ করতে পারবে না এবং পুঁজিবাদকে কখনই ধ্বংস করতে পারবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর নৈরাজ্যবাদের এই স্লোগানগুলো আজকের সমাজে খুব অর্থহীন হয়ে পড়ছে যদি এই জটিল সমাজ টিকিয়ে রাখতে চাওয়া হয় একইসাথে। আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ এত জটিল যে তার চলার জন্য রাষ্ট্রের দরকার রয়েছে এবং বাড়ছে। তুমি রাষ্ট্র ছাড়াই চলতে পারো, যদি তুমি এই জটিল সমাজটাকে ছাড়া চলতে পারো। এবং একই কথা খাটে পুঁজিবাদ ধ্বংসের ক্ষেত্রেও। তুমি যদি এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল জটিলতাকে না হটাও, তুমি পুঁজিবাদকে হটাতে পারবে না। আমরাও চাই মজুরি–শ্রম ও পণ্যর অবসান। কিন্তু আধুনিক দুনিয়াটাই পুঁজিবাদী দুনিয়া। এই আধুনিক দুনিয়া পুঁজিবাদ ছাড়া কীভাবে চলবে? সেখানে কি মানুষ পারিশ্রমিক পাবে না? মজুরি শ্রম ছাড়া এখানকার কাজ কীভাবে হবে? এর একটা উত্তর দেওয়া হয়, সেটা হল অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি। সেখানে শ্রমিকরা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে কীভাবে উৎপাদন হবে, কীভাবে বন্টন হবে। আমি মনে করি এটাও একটা পুঁজিবাদ, কেবল সেটাকে অন্য কিছু নামে ডাকা হচ্ছে। এই যে শ্রমিক নিজেদের মধ্যে বসে ঠিক করবে, দলে দলে কোটি কোটি শ্রমিক বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করবে। তারপর এই মিটিংগুলো কো–অর্ডিনেট করতে হবে। কে করবে?

এই দশকে বিশ্বায়ন বিরোধিতা একটা প্রচন্ড চালু কথা। কিন্তু এটা কতটা বিশ্বায়ন বিরোধী তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে কারণ, বামেরা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নয়। ওরা এই কর্পোরেট, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে। যে কোনও বিশ্বায়নে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন জড়িত। আমরা আক্ষরিক অর্থেই

বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, কারণ আমরা চাই সত্যিকারের বিকেন্দ্রীভূত, আত্মনিয়ন্ত্রিত একটা জগৎ।

প্রশ্নোত্তর পর্বে কিছু প্রশ্নের উত্তরে জের্জেন কিছু ব্যাখ্যা দেন। সেগুলো নিচে দেওয়া হল।

ডমেস্টিকেশনের বিরোধ প্রসঙ্গে

আমরা নতুন কোনও তথ্য বা তত্ত্ব খাড়া করছি না। এই সভ্যতার বিরুদ্ধে বহু তর্ক, প্রতিরোধ বহু আগে থেকে নানাভাবে হয়েছে। বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে থেকে বহু প্রতিরোধ হয়েছে যেগুলো খুব মৌল। এক ধাপে হঠাৎ করে ডমেস্টিকেশন আসেনি। ধীরে ধীরে অনেক আগে থেকে সেটা গড়ে উঠছিল। ব্যাপারটা অনেক জটিল ছিল। আমি সেই জটিলতা পেরিয়ে সেই স্তরগুলোয় যাইনি। এখানের আলোচনা তাহলে অনেক বেশি ডিটেলস-এ চলে যেত। এটা বলা যেতে পারে, শ্রমবিভাজন, বিশেষজ্ঞ নির্মাণ — এটা ডমেস্টিকেশনের প্রাচীন উৎস।

৬০০ কোটি মানুষের প্রয়োজন মেটানো প্রসঙ্গে

আমি মনে করি না ৬০০ কোটি মানুষের প্রয়োজন জোগাড় করার জন্য টেকনোলজিক্যাল মডেল অবশ্যম্ভাবী। কেননা টেকনোলজিক্যাল মডেল মেনে নিলে প্রকৃতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই টেকনোলজি বা এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি সমাধান নয়। এটাই বরং সমস্যা। কোন সমস্যা হলে টেকনোলজি বলে, নতুন কোনও টেকনোলজি নিয়ে আসব তার দ্বারা সমাধান করব, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি তারা একটা সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অন্য একটা সমস্যা ডেকে আনে।

আদিবাসী সমাজ প্রসঙ্গে

আদিবাসী সমাজ বলে একটা সমসত্ত্ব কিছু নেই। আদিবাসীদের মধ্যেও চাষ বা ডমেস্টিক সমাজ ব্যাপকভাবে আছে। হিংসা, পুরুষতন্ত্রের যে প্রমাণগুলো দেওয়া হয় সেগুলি আদিবাসী সমাজের মধ্যে থেকেই দেওয়া হয়, কিন্তু কৃষি-পূর্ব বা আহরণকারী সমাজে এগুলো অনেক আলাদা। সেখানে এগুলো অনেক কম ছিল।

বন্যতায় ফেরা প্রসঙ্গে

এই পরিবর্তনটা তো নিজে নিজে হয়নি। বহু যুদ্ধের রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে মুক্ত সমাজগুলোকে দমানো হয়েছিল। আজকের অবস্থায় এসে ডমেস্টিকেশন থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বহু পথ অতিক্রম করতে হবে। বহু প্রক্রিয়া করা, খাটা-খাটনির ব্যাপার। ফলে এটা কোনও সহজ পথ বলে মনে হয় না কিন্তু প্রশ্নটা দরকার। কিন্তু আমি যদি বলি আমি বন্যতার মধ্যে, প্রি-ডমেস্টিক সমাজে ফিরে যাব, ডি-ডমেস্টিকেটেড করব, এই ভাবনা ভাবলেই যে মনটা বদলে যাবে, ব্যাপারটা তা নয়। এর জন্য দরকার বহু সংগ্রাম। আমাদের চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতিগুলো বদলে ফেলার সংগ্রাম দরকার।

কমিউনিটি প্রসঙ্গে

শারীরিক বা ব্যক্তিগত স্তরে যোগ না থাকলে সেটা কমিউনিটি হতে পারে না। একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থাকবে। ক্ল্যান সোসাইটিতে রাষ্ট্র ছিল না। আধুনিক সোসাইটিতে বা রাষ্ট্রের কেন্দ্রে আছে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা। ক্ল্যান সোসাইটিতে সেই অর্থে কোনও রাজনীতি নেই কেন না সেখানে আমার কোনও প্রতিনিধি নেই। আমি নিজেই সেখানে সরাসরি অংশগ্রহন করি। মাস সোসাইটি আর নাগরিক সমাজের (civil society)র মধ্যে তফাৎ নেই। নাগরিক সমাজ বলে যেটা বলা হয় সেটা মাস সোসাইটি। সেটা চূড়ান্তভাবে বিষাক্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় কোনও বাচ্চা বা কেউ গুলি চালিয়ে বহুজনকে মেরে দিল এবং এটা নিয়ে এই সমাজ কোনও আলোচনা বা প্রশ্ন তুলতে পারে না বা কোনও উত্তর দিতে পারে না। কারণ মানুষ এত অবশ হয়ে গেছে এত অসুস্থ হয়ে গেছে যে তার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। মূলত কমিউনিটির যে বাঁধন সেটা আজ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে।

নোট :

১. **মাস সোসাইটি : যে সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আধিপত্যবাদী সমাজব্যবস্থায় সম্পৃক্ত।**

২. **টেকনোকালচার : যে সিম্বলিক সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে টেকনোলজির সঙ্গে জড়িত।**

৩. **ডমেস্টিকেশন : প্রাণী, গাছপালা এবং নিজেদের (মানুষ) মুক্ত বা বন্যতাকে মানসিক, শারীরিক, এবং প্রজাতিগতভাবে ভেঙে আমাদের সঞ্চয় ও ভোগের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করা, যাতে তার পূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে সে হয়ে ওঠে আমাদের সঞ্চয় ও ভোগের জোগানদার। এর জন্য দরকার হলে তাকে মেরেও দেওয়া যেতে পারে, যদি কাজে না লাগে, আগাছা বলে তাকে শেষ করে দেওয়া হবে। এইভাবে আমরা গ্রহের বেশিরভাগ প্রজাতিকে ধ্বংস করে ফেলেছি।**

৪. **ক্ল্যান সোসাইটি : যৌথ, কৌম সমাজ, যা গ্লোবাল আধিপত্যবাদী সমাজব্যবস্থার বাইরে থেকেছে।**

আবহাওয়া পরিবর্তন ও উপকূলের জনগোষ্ঠী

সুজয় বসু

গত ২৭ অক্টোবর পণ্ডিচেরীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনশুনানি অনুষ্ঠিত হল। শুনানিটি জাতীয় পর্যায়ের। বিষয় : 'আবহাওয়া পরিবর্তন ও উপকূলের জনগোষ্ঠী' (National Public Hearing on Climate Change and Coastal Communities)। এই শুনানিতে সমুদ্র উপকূলের সব ক'টি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী, কেরালা, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত) এবং আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ অংশগ্রহণ করে। আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব উপকূল অঞ্চলে জনগোষ্ঠীগুলির জীবন-জীবিকায় কীভাবে পড়ছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক বিচারকমণ্ডলীর কাছে একে একে পেশ করে। এই শুনানিটির আয়োজনে হাত মেলায় পনেরোটি সংস্থা, অধিকাংশই বিভিন্ন রাজ্যে ধীবর সম্প্রদায়ের কল্যাণ-আন্দোলনে যুক্ত — যেমন, তামিলনাড়ুর নাগপট্টীনামের 'স্নেহ', কর্নাটকের 'স্নেহকুঞ্জ', মহারাষ্ট্রের 'মছিমার ক্রুতি সমিতি', পশ্চিমবঙ্গের 'দিশা', ইত্যাদি। উপকূলের অধিবাসীরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে। এদের প্রত্যেকেই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে অল্পবিস্তর পীড়িত হচ্ছে। সরাসরি তাদের কাছ থেকে মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা জেনে নিয়ে এবং এদেশে অন্যান্য শ্রমপ্রধান পেশায় যারা আছে তাদের প্রতিক্রিয়ার কথাও অনুরূপভাবে সংগ্রহ করে কোপেনহেগেনের বিশ্ব আবহাওয়া সম্মেলনে পেশ করার যে পরিকল্পনা ভারতের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে,

বর্তমান শুনানিটি তারই অঙ্গ।

এই জনশুনানিতে দেশের উপকূলবাসী মৎস্যজীবীরা (ও লবণ প্রস্তুতকারকরা) তাদের জীবিকার ওপর আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্ষয়ক্ষতির আশংকা এবং ক্ষতির পরিমাণ অনুমানের কথা এবং এই ক্ষতি উপশমের জন্য তাদের পক্ষে করণীয় পদক্ষেপগুলির কথা এক বিচারকমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরার কথা। বিচারকমণ্ডলীর মন্তব্য সহ উপকূলবাসীদের বক্তব্যের সারাংশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবিতে ভারতের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রতিবেদনে স্থান পাওয়ার কথা।

পণ্ডিচেরীতে আগের দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর থেকে প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল নাগপট্টীনামের 'স্নেহ' সংস্থাটি। সংস্থা-প্রধান শ্রীযুক্তা জেসু রেটিনামের অত্যন্ত দক্ষ নেতৃত্বে প্রতিনিধিদের যথাযথ আতিথেয়তা ছিল ত্রুটিহীন। পণ্ডিচেরীর মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী ইলানগোবান-এর সহযোগিতাও ছিল প্রশংসনীয়।

পণ্ডিচেরী শহরের কেন্দ্রে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সরণির ওপর একটি বড়ো সভাগৃহে পাঁচশ'র বেশি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শুনানি শুরু হয় সকাল দশটায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পণ্ডিচেরীর মুখ্যমন্ত্রী এম ভাইয়ালিঙ্গম। তাঁর ভাষণে তিনি আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির কথা বলেন এবং উপকূলবাসীদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার জন্য ভারত সরকারের দায়িত্বের উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিককালে সুনামি যেভাবে উপকূলে আঘাত হেনে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করেছিল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, যা এখনও অসম্পূর্ণই রয়েছে, সরকারি প্রস্তুতি ও তৎপরতায় আরও জোরালো করার এবং এই সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর তামিল ভাষায় বক্তব্য সাংবাদিক ও মৎস্যজীবী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সাথী সেতুরামলিঙ্গম ইংরেজিতে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেন। চা পানের বিরতির পর মূল অধিবেশন শুরু হয়।

শুনানিতে একে একে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাদের অভিজ্ঞতা ও আশংকার কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শ্যামল মণ্ডল, তামিলনাড়ুর শ্রীমতী অজন্তা, উড়িষ্যার মঙ্গলরাজ, অন্ধ্রের পি তিরুপতি, কর্নাটকের দামোদর পাটগার, মহারাষ্ট্রের আর কে পাতিল, আন্দামান-নিকোবরের পথিরাজ, লাক্ষাদ্বীপের জাফের হাসাম, গুজরাত-কচ্ছের আহমেদ ইলিয়াস ও অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধি-প্রধানরা একে একে মঞ্চে আসেন। আবহাওয়া পরিবর্তন এখন পর্যন্ত যে পরিবর্তন এনেছে তা খুব যে বেশি তা বলা যায় না। কিন্তু এদের অনেকের কাছেই সুনামির প্রবল বিপর্যয় থেকে জীবনরক্ষার মরীয়া অভিজ্ঞতা এখনও অম্লান। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝা যেগুলি আরও বেশি করে উপকূলে আঘাত হানবে বলে আবহাওয়াতত্ত্ববিদরা বলছেন তা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থাদির কথাও এঁরা বলেন। স্থানীয় সমস্যাদিও এঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। যেমন শ্যামলবাবু সুন্দরবন রক্ষার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। দক্ষিণবঙ্গের এই বনাঞ্চল যে বন্যা থেকেই উপকূলকে রক্ষা করবে তাই নয়, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ-পাখি ও অন্যান্য জীবদেরও আশ্রয়স্থল এই বনভূমি। ইদানীং বহু জায়গাতেই চিংড়ি চাষের জন্য বন কেটে ভেড়ি করা হয়েছে। এর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যা নেওয়া হয়েছে তা একান্তই অপর্যাপ্ত, এমনই অভিমত শ্যামলবাবুর।

সুনামির অংশ বাদ দিলে আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত সমস্যাগুলি সব রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। সেগুলি হল :

১. মাছের লভ্যতা কমেছে এবং কমছে। আগে সমুদ্রে ২-৩ কিমি গেলেই যে মাছ পাওয়া যেত, এখন ৪-৫ কিমি গেলে তা পাওয়া যায়। ফলে মোটর চালিত নৌকা ছাড়া আগের মতো মাছ ধরা সম্ভব হচ্ছে না। ধীবর সম্প্রদায়ের দুর্বল অংশ প্রতিযোগিতায় না পেরে অন্যান্য পেশায় যাওয়ার চেষ্টা করছে।

২. কোন কোন প্রজাতির মাছ, আগে যেগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। অভিজ্ঞদের ধারণা মাছের প্রজনন তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যই হোক বা কমবেশি লবণাক্ততার জন্যই হোক, কমছে। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক দূষণও এর জন্য দায়ী। বহু নদীর মোহানায় স্বাদু জল আগের মতো পরিমাণে পৌঁছচ্ছে না। বিপরীতে মোহানা থেকে উত্তরে নোনা জল উঠছে।

৩. প্রায় সব রাজ্যেই সমুদ্র উপকূলে বিশাল ভূমিক্ষয় হয়েছে। সমুদ্র ওপরে উঠে এসেছে — বালিয়াড়ি জলে ডুবেছে। এর ফলে বেলাভূমি সংকীর্ণ হয়েছে। জাল শুকোনো, মাছ শুকোনো, জাল বোনা-মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব বাড়ছে।

৪. আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে। বর্ষা আসছে দেরিতে। হঠাৎ হঠাৎ এক নাগাড়ে ঝড়-বৃষ্টির সংখ্যা বাড়ছে। এই সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখতেই হয়। আগে ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ এত বেশি ছিল না।

৫. উপকূল অঞ্চল আগে যতটা শান্ত ছিল, এখন আর তা নেই। বালি তোলা, জেটি করে মালপত্র আনা-নেওয়া ইত্যাদিতে উপকূল এখন উপদ্রুত। পর্যটন কেন্দ্রগুলি উপকূলভূমিকে নানাভাবে দূষিত করছে।

এই পরিবর্তনগুলি মৎস্যজীবীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আওতায় এসেছে। যেগুলি আসেনি, সেগুলি হল :

- সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ছে। বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেওয়ার জন্য বাড়ছে সমুদ্রজলের অম্লতা। প্রবাল-প্রাচীর (Coral Reef)-গুলি এই অম্লতায় প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতি সম্প্রতি উপগ্রহ থেকে তোলা চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে মান্নার উপসাগরের প্রবাল-প্রাচীরের অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রবাল-প্রাচীরের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। এর সুরক্ষার প্রয়োজন।
- বড়ো বড়ো ট্রলার যে জালে মাছ ধরে, তা সমুদ্রের তলা অবধি যায়। স্বল্প গভীরতায় তলদেশে যে মাছ ও অন্যান্য জলজীবরা বংশবৃদ্ধি করে, সেই প্রজননভূমি এই জাল টানায় বিপর্যস্ত হয়। খুব ছোটো ফাঁকের জালে যে মাছ ট্রলারগুলি ধরে, তার একটা বড়ো অংশ বিপননযোগ্য নয় বলে ফেলে দেয় — ততক্ষণে মাছগুলি আর জীবিত থাকে না। এই ক্ষয় সাম্প্রতিককালে খুব বাড়ছে।
- একদিকে যেমন কিছু কিছু বন্দর ব্যবসার অভাবে মৃতপ্রায়, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্যে নতুন বন্দর তৈরির হিড়িক পড়েছে। বন্দর তৈরিতে যে ভারি কাজকর্ম হয়, তা স্বাভাবিকভাবেই উপকূলের শান্ত অবস্থার পরিপন্থী। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে, উপকূলে ছোটোখাটো বাঁধ দিয়ে জেটি ইত্যাদি তৈরি করার ফলে সেখানে ভূমিক্ষয় হয়েছে এবং সমুদ্র অনেকখানি ভিতরে চলে এসেছে। তামিলনাড়ুতে এটা বেশিমাত্রায় ঘটেছে।
- বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে প্রচুর জলের দরকার হয় বাষ্পকে শীতল করে তরল জলের অবস্থায় আনতে। উপকূল অঞ্চল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষে প্রশস্ত, কারণ জলের অভাব নেই। পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের দক্ষতা কম হওয়ায় জলের প্রয়োজন বেশি। বিদ্যুৎকেন্দ্রে শীতলীকরণের পর জলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই জল নদী সমুদ্র যেখানেই ফেলা হোক না কেন স্থানীয় তাপমাত্রা বাড়বে। উষ্ণ জলে মাছের প্রজনন আদৌ ব্যাহত হবে না তা বলা যায় না। যে হারে উপকূল অঞ্চলে পরমাণু

বিদ্যুৎকেন্দ্র বসছে, তাতে মাছের লভ্যতা কমার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই সতর্ক করে আসছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁদের কথা উপকূল-উন্নয়ন কর্মীদের কাছে পৌঁছচ্ছে না।

শুনানি শেষ হলে বিচারকমণ্ডলীর তিন সদস্য মুম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয় এইচ সুরেশ, বিশিষ্ট মৎস্যচাষ-বিশেষজ্ঞ ত্রিবান্দ্রমের নলিনী নায়ক ও কলকাতার বর্তমান নিবন্ধকার তাঁদের পৃথক পৃথক অভিমত পেশ করেন। বিচারপতি সুরেশ জোটবদ্ধ হয়ে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার কথা বলেন। বিভিন্ন রাজ্যের মৎস্যজীবী সংগঠনের যে কেন্দ্রীয় সমিতি তাকে বলশালী করে করণীয়গুলি করবার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। প্রথমে ভারত সরকারের কাছে এই সমস্যাগুলি তুলে ধরে প্রতিকার দাবি করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সমস্যার সমাধান আলোচনায় নিয়ে আসা। যেহেতু কিছুদিনের মধ্যেই আলোচনা শুরু হচ্ছে, এই শুনানির সারাংশ পৌঁছলেই আপাতত চলবে। শ্রীমতী নায়ক আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করেন এবং এর প্রতিকারে স্থানীয় স্তরে কী কী করণীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহণীয় প্রস্তাবগুলির উল্লেখ করেন। বর্তমান নিবন্ধকার উপকূল সুরক্ষার স্বার্থে দুটি পরামর্শ দেন — প্রথমত, তটরেখার পরবর্তী কমপক্ষে পাঁচ কিলোমিটার অবধি ঘন বনসৃজন করা এবং উপকূলে সবরকম ভারি নির্মাণকাজ অবিলম্বে বন্ধ করা এবং ভবিষ্যতে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গেই সবদিক যাচাই করে নির্মাণ প্রস্তাব অনুমোদন করা, যদি একান্ত করতেই হয়। সামান্য কিছু প্রশ্নোত্তরের পর সভার কাজ শেষ হয়।

পরিশিষ্ট

গুজরাত কচ্ছ থেকে এসেছিলেন আহমেদ ইলিয়াস, সত্তরের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু শরীর এখনও শক্ত, মুখেই কেবল একটু নোনা জলের ছাপ। সভাশেষে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি বলে, হরেকৃষ্ণ দেবনাথের কথা। আমার সঙ্গে হরেকৃষ্ণবাবুর পরিচয় আছে জেনে খুশি হলেন। এর আগে প্রথম যখন হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র করার প্রস্তাব ওঠে, তখন তমলুকে সভা করতে গিয়ে আলাপ হয় এবং প্রথম সাক্ষাতেই ভালোবেসে ফেলি তাঁকে। তেজী মানুষ — অসাধারণ জোরালো বক্তব্য রাখেন — আবেগপ্রধান নয় যুক্তিপ্রধান। পদার্থবিদ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম ও শেষ হিন্দু সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গবন্ধু মুজিবের খুবই ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। মুজিব হত্যার পর এই বঙ্গে আসেন এবং 'ন্যাশনাল ফিশারমেন্‌স ফোরাম' NFF—এর সর্বভারতীয় সভাপতি হন। এমনকী রাষ্ট্রসংঘেও তিনি মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আহমেদভাইকে হরেকৃষ্ণ কেমন আছে বলতে পারিনি, বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই বলে। ফিরে এসেই হরেকৃষ্ণর খবর নিই এবং জানতে পারি ও অসুস্থ, ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছে। তারপর পেলাম হরেকৃষ্ণ দেবনাথের মৃত্যুর খবর। আমি নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের যোগ্য অকালে প্রয়াত এই বলিষ্ঠ মানুষটির প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

পত্রিকা পর্যালোচনা

আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও সুন্দরবন অঞ্চলের এক পত্রিকা

অভ্র ঘোষ

বেশ কয়েক বছর ধরে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, পত্রিকাটির নাম 'নিম্ন-গাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র', সম্পাদনা করছেন বিমলেন্দু হালদার। পত্রিকাটি ষান্মাষিক এবং কলেবরে তেমন বৃহৎ নয়, কিন্তু গুণমানে সমৃদ্ধ।

আমাদের সারস্বতচর্চায় সাম্প্রতিককালে নানাধরনের সমস্যা ও দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হলেও পাশাপাশি স্বাস্থ্যপ্রদ ঘটনাও কিছু কিছু ঘটছে। তার মধ্যে একটি বোধহয় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রতি মনোনিবেশ। এই কাজটি সম্পাদনের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা, প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ, পুরাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহ, ভাষা-উপভাষার বিশ্লেষণ, লোকসংস্কৃতি কিংবা আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষ প্রয়োজন অঞ্চলটির ভৌগোলিক বিশেষত্ব কিংবা তার নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। এসব কাজের জন্য বই, পত্র-পত্রিকা, জেলা গেজেটিয়ার বা অনুরূপ সরকারি-বেসরকারি দলিল-দস্তাবেজ অবশ্যপ্রয়োজনীয় এবং সেসব উপাদান সংগ্রহের জন্য ছোটোবড়ো গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এসবের সঙ্গে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কৌমভুক্ত মানুষজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধি। মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন মানুষজনের বহুকাল-সঞ্চিত জ্ঞানবুদ্ধির সরাসরি যোগ ছাড়া কোনও অঞ্চলের ইতিহাসই প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। বাইরের গবেষক-পণ্ডিতদের পুঁথিগত জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু তার সঙ্গে লোকায়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বোধের সম্মিলন না ঘটলে অঞ্চলের ইতিহাস নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে না। সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস নির্মাণ করতে হলে আরও এক আটপৌরে সমস্যার কথা জানিয়েছেন সমালোচ্য পত্রিকাটির সম্পাদক : 'একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া যায় নিম্নবঙ্গের ইতিহাস রচনার কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। অসংখ্য নদী-নালা-খাল-বিল-নেচা-খাড়ি প্রভৃতি আর বনজঙ্গলে ভরে আছে এই দেশের অনেক অঞ্চল। সেগুলি দুর্গমও বটে। ধু ধু মাঠ, কর্দমাক্ত পথ, অপরিছন্ন পরিবেশ, সাপ-বাঘ-কুমীর-কামট, অন্যান্য হিংস্র জন্তু জানোয়ার এমনকী ডাকাতেরও অভাব নেই এখানে। ফলে ক্ষেত্র-গবেষক, পর্যবেক্ষকদের খুব কষ্ট করে প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। বিশেষ করে বাইরের মানুষের পক্ষে বিপদসঙ্কুল এই দেশ। তাই ক্ষেত্র-গবেষণার কাজে এগিয়ে আসতে হবে স্থানীয় মানুষদের। এখানকার 'মাটির মানুষ' (sons of the soil)-দের এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবেই প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করা এবং যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর হবে।'

সুন্দরবনের ভৌগোলিক প্রকৃতি, জল-জঙ্গল, ম্যানগ্রোভস কিংবা তার জলবায়ুর প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান, তার নদ-নদী, খাল-বিল-খাড়ির বৃত্তান্ত, তার চাষবাসের সমস্যা ও বিকল্প চাষবাসের পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে এই পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা স্থান পায়। অভিজ্ঞ ও

অঞ্চলের পারদর্শী মানুষেরা কিংবা বাইরের পণ্ডিতজনেরা সেসব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার কাজে সতত তৎপর থাকেন। গৌতমকুমার দাশ, কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন নস্কর, দেবীশংকর মিদ্যা, অনিমা মণ্ডল মিস্ত্রি প্রমুখ আরও অনেক লেখকের রচনায় এসব বিষয়ে অজস্র তথ্য ও বিশ্লেষণ মেলে। ২০০৬–এর জুন মাসে এবং ২০০৮–এর জানুয়ারি মাসে বছর দেড়েকের ব্যবধানে এই পত্রিকার দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। নদ–নদী–খাল–বিল ছিল তার অধীত বিষয়বস্তু। গবেষকদের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, বর্তমানে সুন্দরবনে একত্রিশটি ছোটো–বড়ো নদী রয়েছে। অতীতে আরও অসংখ্য নদী ছিল যা এখন মজে গেছে। বহু নদী সুতি খালে পরিণত হয়েছে। আবার বহু শাখানদীরও জন্ম হয়েছে। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, নদ–নদীর সঠিক হিসেব পাওয়া কখনও কখনও একটু শক্ত হয়ে পড়ে, কারণ একই নদীর বহু আঞ্চলিক নাম। ‘পাথরপ্রতিমা থানার গোবধিয়া নদীকে — গোবধিয়া, বকচরা এবং মৃদঙ্গভাঙা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঠাকুরান নদীর আর এক নাম জামিরা। গোসাবা এবং গোমর একই নদী। হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর আর এক নাম ঘুঘুডাঙা নদী বা ঘুঘুডাঙা গাঙ।’ — এসব তথ্য পাচ্ছি সম্পাদক বিমলেন্দু হালদারের লেখাতেই। সুন্দরবনের শ–খানেকের কিছু বেশি দ্বীপ এই নদীগুলি দ্বারা বেষ্টিত, এসব অঞ্চলে অসংখ্য জীববৈচিত্র্য আর ঘন অরণ্যানি। নদীগুলির স্বাস্থ্যের ওপরেই নির্ভরশীল সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভস ও জীবপরিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ, নদীগুলি বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। বস্তুত এই নদীর ভরণপোষণেই সুন্দরবনের জঙ্গল, বনজ সম্পদ, কৃষি ও কৃষিজ সম্পদ আর এই নদীগুলিতেই জন্মাচ্ছে চিংড়ি–কাঁকড়া সহ কত বিচিত্র ছোটোবড়ো মাছ। সেই নদ–নদীর যথাযথ সংস্কার আর রক্ষণাবেক্ষণ না ঘটলে বিপর্যস্ত হবে সমগ্র গাঙ্গেয় বঙ্গের পরিবেশ, বস্তুত পারিবেশিক সেসব সমস্যা দুর্লক্ষ নয় এখন। পত্রিকার এই দুই বিশেষ সংখ্যা মনোযোগ দিয়ে পড়লে তার আভাস পাওয়া যাবে।

পরবর্তী সংখ্যাতে সুন্দরবনের মানুষদের লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকসংস্কৃতির বিচার–বিশ্লেষণ চোখে পড়ে। বিমলেন্দু হালদার, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, প্রদ্যুৎকুমার সরদার, দেবীশংকর মিদ্যা, সুভাষ মিস্ত্রি প্রমুখ লেখকদের ছোটো ছোটো গবেষণাধর্মী রচনাগুলিতে ছড়িয়ে আছে এসব বিষয়ে প্রচুর তথ্য ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। মানুষের রোগ শোক দুঃখসহ দৈনন্দিন দিনযাপনের নানা সমস্যার নিরসনে অজস্র লৌকিক দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের বিবরণ এসব রচনায় মেলে, সঙ্গে থাকে বনদেবীর প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা যিনি রোগ–শোকের প্রতিকারিনী নন, যিনি সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর শ্বাপদ–সঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে ভক্ত মানুষকে উদ্ধার করেন। তারই পাশাপাশি সন্ধান মেলে লুপ্তপ্রায় মন্দির বা অন্য স্থাপত্যাদির ইতিহাস বা নাথধর্ম জাতীয় বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ। অজস্র উপাদানের ভিত্তিতে লোকায়ত সংস্কৃতির বিশ্বস্ত অবয়ব এইভাবেই গড়ে উঠতে থাকে।

লোকপ্রযুক্তির ধারণা দেবারও চেষ্টা হয়েছে এ–পত্রিকায়। কৃষ্ণকুমার মিদ্যা এই প্রসঙ্গেই লিখেছেন হুঁকো বিষয়ে কিংবা তেলোডোঙা প্রযুক্তির কথা। দেশজ প্রথায় জলসেচের জন্য কিংবা পুকুর ছেঁচার জন্য তালগাছ দিয়ে তৈরি ডোঙার নাম তেলোডোঙা। সেসব তেলোডোঙা এখন আর তেমন ব্যবহৃত হয় না, উন্নত যন্ত্রযুগ এখন দেশজ প্রযুক্তিকে বাতিল করে নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। সাংস্কৃতিক ধারাও পাল্টাচ্ছে। বিস্মৃতপ্রায় লোকপ্রযুক্তির বিশ্লেষণমূলক লেখাগুলিতে সামাজিক পরিবর্তমানতার ধারাগুলিও লক্ষ করার মতো। অনিমা মণ্ডলমিস্ত্রি যখন সুন্দরবনের বিলুপ্তপ্রায় খেলাধুলো নিয়ে লেখেন তখনও এই সোশ্যাল ডিনামিক্সের আবহটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

এই রকম নানা দিক থেকে সুন্দরবনের সাহিত্য, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, প্রত্নসংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য–সংগ্রহ ও সীমিত পরিসরে বিশ্লেষণ করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গবেষক যে–কাজটি করে চলেছেন তা রীতিমতো অভিনন্দনযোগ্য। বস্তুত এইসব তথ্য ও আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতেই সুন্দরববনের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে এবং সেটাই হবে আমাদের এক মহার্ঘ সম্পদ।

দান্তেওয়ারার আশপাশে

সিদ্ধার্থ মিত্র গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ছত্রিশগড়ের দান্তেওয়ারা গিয়েছিলেন, সালওয়া জুডুমের অত্যাচারে গ্রামছাড়া হওয়া মানুষদের গ্রামে ফিরে আসার পর সেই গ্রামগুলোকে সরেজমিনে দেখতে। ফিরে এসে তিনি লেখেন তাঁর সফরবৃত্তান্ত, ***An account of the trip to rehabilitated villages near Dantewada****। এর অংশবিশেষ বাংলায় অনুবাদ করেছেন শমীক সরকার।*

আমরা ঠিক করলাম গাড়িতে যাব, কোপা বলেছিল গাড়িতে বেশিরভাগটাই যাওয়া যাবে। যদিও পরে দেখেছিলাম, সেটা ঠিক না। রাস্তার প্রথম অংশটা গাড়িতে যাবার যোগ্য, পাথর আর মাটি দিয়ে ঠাসা। সদ্য বৃষ্টি চারপাশের নিসর্গের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নিরক্ষীয় বনানী উপচে পড়ছে সবুজে। টলটলে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে রাস্তার মাঝ দিয়ে, নিচ দিয়ে। মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। কিছুক্ষণ পরেই আমরা পেরিয়ে গেলাম একটা ঘন জঙ্গল। তারপর এল চাষজমি। করাল চিহ্নের মতো ছেয়ে থাকা বাইলাডিলা পর্বতমালা তৈরি করেছে যার পটভূমি।

বাইলাডিলা কথার অর্থ ষাঁড়ের কুঁজ। পর্বতশ্রেণীটির চূড়াগুলো ওরকমই দেখতে, আর তাই এই নাম। এই অনিন্দ্য পর্বতশ্রেণীটি, যার মুখ ঢেকে আছে দন্ডকারণ্য অরণ্যের অংশ এখানকার ঘন জঙ্গলে, বছরের পর বছর ধরে পালপোষ করেছে গন্ডী উপজাতিদের। এই পাহাড়ের গায়ে বা পাদদেশে থেকেছে তারা। পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে এসেছে অনেক নদী, জলের ধারা। আশ্রয় পেয়েছে বন্য জন্তু জানোয়ার, যাদের শিকার করে খাবার সংগ্রহ করেছে স্থানীয় গন্ডীরা। আর আছে বিবিধ গাছপালা, জীব, আছে ভেষজ গাছড়া।

কিন্তু এই পাহাড় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আশেপাশে বসতি করা মানুষের কাছে এক অভিশাপের মতো।

কারণ বাইলাডিলা কোনও সাধারণ পাহাড়শ্রেণী নয়। এতে যা লোহার আকরিক জমে আছে, তা বিশ্বে এক অন্যতম। পাহাড়ে চোদ্দটি জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে আকরিক, যার পরিমাণ দাঁড়াবে মোট তিরিশ হাজার লক্ষ টন। যার মধ্যে বারো হাজার লক্ষ টন ‘উচ্চ শ্রেণীর’। এনএমডিসি–র খনি কর্তাদের মতে, বাইলাডিলা বিশ্বের লোহা আকরিকের বাজারে একটা নাম, এর উচ্চ শ্রেণীর কারণে। এখানকার আকরিকে লোহার পরিমাণ ৬৬ শতাংশ, গন্ধক বা অন্য কোনও বেজাতের মিশেল নেই, স্টিল তৈরিতে এর জুড়ি মেলা ভার।

আর এখানে থাকে মূলত গন্ডীরা, ভারতের পূবের দিকের জঙ্গলেই যাদের আদি বাস। বাইলাডিলা যে জেলায়, সেই বস্তার–এ আদিবাসী জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ, যা ভারতের আদিবাসী জনঘনত্বে বেশ ওপরের দিকে।

এই বাইলাডিলার লোহার আকরিক এখানকার গন্ডীরা ব্যবহার করে যুগ যুগ ধরে, তাদের সুন্দর সুন্দর ধাতব কারুশিল্পে।

আজ ভারতের বৃহত্তম খনি কোম্পানিগুলির নজর পড়েছে এই আকরিকে।

অনেক বছর ধরেই এখানে খনন হচ্ছে, কিন্তু পড়ে আছে অনেক এখনো, আরো ৩০–৪০ বছরের মতো। নয়ের দশকের শেষাশেষি ভারত সরকারের ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কমিশন বা এনএমডিসি–র ভেঙে পড়ার সাথে সাথেই প্রাইভেট মাইনিং কোম্পানিগুলির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

আর ২০০০ সালে তৈরি হওয়া ছত্রিশগড় সরকারের আকর্ষণীয় প্রস্তাবের লোভে তারা হাজিরও হয়ে গেছে চটজলদি। ২০০৫ সালের জুন মাসে টাটা স্টিল ছত্রিশগড় সরকারের সাথে একটা মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সই করে। টাটা স্টিলের প্রকল্পটি দশ হাজার কোটি টাকার, যা প্রাথমিকভাবে ২০ লক্ষ টন এবং তারপর ৩০ লক্ষ টন লোহা তুলতে সক্ষম। এর এক মাসের মধ্যে ছত্রিশগড় সরকার এসার গ্রুপের সাথে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার জেরে এই কর্পোরেটটি প্রথমে ১৬ লক্ষ টন ও তারপর ৩২ লক্ষ টন লোহা তুলতে সক্ষম হবে।

বেশিরভাগ লোহার আকরিকই ধুয়ে এখান থেকে পাইপে করে পাঠানো হবে বিশাখাপত্তনমে। সেখান থেকে অর্ধেক যাবে জাহাজে করে জাপানে। এর জন্য ২৬৭ কিমি লম্বা পাইপলাইন এখনই আছে বাইলাডিলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যে, যা বোধহয় বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম। অবশ্যই এই আকরিকের ধোয়ার ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়বে। বস্তার জেলার দুটি নদী, শঙ্খিনী এবং দঙ্খিনীর তামাটে লাল জল এই ধরনের মাইনিংয়ের পরিবেশগত কুপ্রভাবের প্রমাণ।

কিন্তু এই পরিবেশের ক্ষতি এখানকার মাইনিং বাদশাদের মূল চিন্তার বিষয় নয়। যতদিন এখানে নকশালরা সক্রিয় আছে, আর যতদিন এখানকার ভূমিপুত্ররা সম্ভাব্য মাইনিং ক্ষেত্র তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে না যাচ্ছে, ততদিন এই খননকার্য এগোবে না।

আইন মোতাবেক, যাদের সরাসরি উচ্ছেদ হতে হবে জমি থেকে সেই গ্রামবাসীদের সম্মতি পেলে তবেই অঞ্চলটি মাইনিং কোম্পানিগুলির হাতে ছাড়া যাবে। কিন্তু চাষিদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে এই সম্মতি না মেলার আশঙ্কায় রাষ্ট্র তড়িঘড়ি মাঠে নেমে পড়ে। টাটা স্টিলের জন্য জমি অধিগ্রহণের জনশুনানি পরিণত হয় প্রহসনে। সালওয়া জুডুম গ্রামবাসীদের ভয় দেখায় যখন তারা জড়ো হয়েছিল শুনানিতে যাওয়ার জন্য, আর দান্তেওয়ারা পুলিশ সেই পথে ব্যারিকেড করে জনশুনানিতে আসা আটকায়। জনশুনানিতে এমতাবস্থায় গ্রামবাসীদের বক্তব্য বড়ো একটা শোনা যায়নি।

কিন্তু নকশাল সমস্যাটি আলাদা রকমের। দুটো রাস্তা আছে নকশালদের তাড়ানোর। ওখানে দীর্ঘমেয়াদীভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নেওয়া, যা দারিদ্র্যকে দূর করবে এবং যা এই নকশাল আন্দোলনও চায়। আর অন্যটা হল 'ভিয়েতনামের কায়দা'। গ্রামবাসীদের এবং উপজাতিদের নির্দিষ্ট কিছু ক্যাম্পে সরিয়ে দাও এবং জমিতে আকাশ থেকে তীব্র সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে জঙ্গল থেকে মাওবাদীদের বের করে দাও। মৌ–এর ফাঁস গলায় আটকে ছত্রিশগড় সরকার নিল এই দ্বিতীয় পথটাকে।

জন্ম নিল সালওয়া জুডুম (গন্ডী ভাষায় যার অর্থ 'পরিশুদ্ধিকরণ'), সশস্ত্র নজরদারী গোষ্ঠী, নকশালদের সাথে লড়াই করার জন্য। বেশির ভাগ জুডুম সদস্যই স্থানীয় উপজাতি এবং দলিত। কিন্তু এর নেতারা সব স্থানীয় শহরের ব্যবসায়ী, যারা বেশ মুশকিলে পড়েছিল জঙ্গলের জিনিস নকশালদের কব্জায় থাকায়। তৈরি হবার পর থেকেই এই জুডুমের সদস্যরা মিলিটারি এবং স্থানীয় পুলিশ সাথে নিয়ে গ্রামকে গ্রাম ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের ক্যাম্পে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। গ্রামবাসীরা ছাড়তে চায়নি তাদের পূর্বপুরুষের বসত, কিন্তু তারা আর কীই বা করতে পারত।

জুডুমরা মুন্দেরে এসেছিল বছর চারেক আগে। তার পরেই গ্রামবাসীরা পালায়। তারপর আস্তে আস্তে হিংসা একটু কমলে, এবং সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে সমস্ত গ্রামবাসীদের গ্রামে ফেরানোর নির্দেশ দিলে বছর খানেক আগে তারা আবার গ্রামে ফেরে।

আমরা গাড়ি একজায়গায় রেখে শেষ দু'মাইলের মতো কাদাভরা রাস্তায় হেঁটে চললাম। মাঝে মাঝে জলে ভরা ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম কোপার সঙ্গে :

—— সালওয়া জুডুম শুরু হল কী করে?'

কোপাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—— ও তো আগে থেকেই ছিল। প্রথমে কিছু মানুষ নকশালদের বিরুদ্ধে ছিল। ঝগড়া হত। ওরা এককাট্টা হলে নকশালরা ওদের মেরে দিত। এটা অনেকদিন ধরে চালু ছিল।

কোপা উত্তর দিল।

—— এখন সরকারের মনে হয়েছে যে তাদের এইটা থেকে কিছু ফায়দা হতে পারে। তখন সরকারই এদের বন্দুক দিল, মিলিটারির মদত দিল। তারপর এই লোকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে থাকল।

কেউ অবাক হতে পারেন, নকশালদের বিরোধিতা করছিল যে উপজাতীয় মানুষরা, তাদের প্রতি এমন সহানুভূতি কেন সরকারের, যদি এই নতুন মাইনিংয়ের স্বার্থের কথা মাথায় না থাকে!

—— কিন্তু গ্রামবাসীরা কি এটার কথা জানে?

—— আর যারা জুডুমের দলে যোগ দিয়েছিল, তাদের ঘরের সবাই গাঁ ছেড়ে শহরে চলে গেল। তাদের দাদা, ভাই, বোন সবাই।

উপজাতিদের মধ্যে একটা ভাগাভাগি ছিল। সালওয়া জুডুম এটা নগ্ন করে দিল। সমাজটা এবার ভেঙে গেল ওই ভাগাভাগির জায়গা থেকে। তুমি হয় সালওয়া জুডুম অথবা নকশাল। মাঝামাঝি কিছু নেই।

শিগগিরিই আমরা কয়েকটা ছাদবিহীন, ভাঙা মাটির বাড়ির মুখোমুখি হলাম। আর কয়েকবার বৃষ্টি হলেই এই মাটির বাড়িগুলো ভেঙে মিশে যাবে মাটিতে। গ্রামে ফিরে যাবার আগে গ্রামবাসীরা এই সালওয়া জুডুম ক্যাম্পগুলিতে ছিল। কোপা বলল, এগুলোর আগে ছাদ ছিল, গ্রামবাসীরা এগুলো ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় ছাদগুলো খুলে নিয়ে গেছে। যদিও আমি তখনও ভাবছিলাম, কীভাবে এখানে মানুষ থাকতে পারে!

ছাদগুলো টিনের ছিল।

—— কোপা বলল। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয়রা খড়ের ছাউনি দেয় ঘরে।

—— প্রথমে যখন গ্রামবাসীরা ঘর ছেড়েছিল, ওরা দূরের একটা ক্যাম্পে গেছিল। তারপর গ্রামে ফেরার কিছু আগে তারা এই ক্যাম্পে আসে। যেহেতু এটা গ্রামের অনেক কাছে।

ডানদিকে আরও এরকম ধ্বংসাবশেষ পড়েছিল। আর কী আশ্চর্য, ওখানে একটা ছাদওয়ালা ঘরও রয়েছে, এখনো কেউ আছে ওখানে। আমি

কোপাকে জিজ্ঞেস করতে বলল,

— হয়তো এই ঘরটা ওর খেতের পাশেই, তাই এখানে রয়ে গেছে।

তাই কি? না কি ওরা গ্রামে সমাদৃত নয়, তাই?

গ্রামে ঢোকার ঠিক আগে একদল গ্রামবাসীর সাথে দেখা হল, যাদের কোপা চেনে। কোপা নিজেও একজন গোন্ডী এবং সম্ভবত এদের পরিজন। কিন্তু তাদের সাথে ওর সাংস্কৃতিক বিরোধ সহজেই বোঝা যায়। কোপা পড়ে আছে টি শার্ট, প্যান্ট, ঘড়ি। ওদের খালি পা, ঐতিহ্যগত পোষাক। ওরা কোপাকে দেখে উদ্বেলিত, তাতে কোনও লুকোছাপা নেই। আমি গোন্ডী বুঝি না, কিন্তু তাদের উচ্ছ্বাসটা বুঝতে পারছিলাম। আর কোপা, শহরের আর পাঁচটা লোকের মতোই, অনেক সংযত। ওরা কথা দিল, গ্রামের সব লোককে ডাকবে, যাতে আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি।

গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং নজরে এল। দাঁড়িয়ে আছে শান্তি চিহ্ন হয়ে। কোপা না বললে বুঝতেই পারতাম না ওটা ছিল একটা স্কুল। কয়েকটা গরু ঘাস খাচ্ছে, আর এমন ভাবে দলবেঁধে, যেন মনে হচ্ছে যে তারা স্কুলের ঘন্টি শুনে এগোচ্ছে স্কুল ঘরের দিকে।

— জুডুম এখানে স্কুল খুলতে দেয়নি। বলেছে, বাচ্চারা ক্যাম্পে স্কুলে যাবে। তাই এখন স্কুল বন্ধ।

কোপা বলল।

সালওয়া জুডুম মানে কেবল গ্রামবাসীদের গাঁ ছাড়িয়ে ক্যাম্পে তোলা নয়। এর মানে একটা নতুন নির্দেশতন্ত্রের জন্ম। যদিও ভারতের ৬০ শতাংশ লোক চাষি, আদিবাসী বা কৃষি শ্রমিক, তাদের জিডিপিতে ভাগ মাত্র ২৬ শতাংশ। নতুন নির্দেশতন্ত্রে যখন বেশিরভাগ মানুষ শহরে থাকবে, আর বিভিন্ন শিল্পে, খনিতে কাজ করবে, তখন সে অর্থনীতির একটা মানে থাকবে। রাষ্ট্রের কি এই মতলবও ছিল, যখন সে সালওয়া জুডুম তৈরি করছিল?

চাষবাস ও গরু ছাগল পালপোষ করা ছাড়াও গ্রামবাসীরা নির্ভর করে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের ওপর, যেমন স্কুল, অঙ্গনওয়ারি, গ্রাম পঞ্চায়েত। জুডুম চেয়েছিল, ক্যাম্পেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে। জুডুমের খুব ইচ্ছাও ছিল না, গ্রামবাসীরা ফিরে আসার পর গ্রামের অবস্থা স্বাভাবিক হোক। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তারা এটা আটকাতেও পারছিল না।

না কি অন্য কোনও কারণ আছে, স্কুলটা না খোলার?

স্কুল বাড়ির লাগোয়াই স্কুলের শিক্ষকের বাড়ি। বড়ো বাড়ি। বাড়ির সামনের দিকটায় একজন, বোধহয় ছেলে, কাঠের কাজ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল কেন বন্ধ? সে বলল, এর মধ্যে অনেক কিছু ব্যাপার আছে। ফিরে আসবে যখন, তখন এখানে আসবে, বলব।

জুডুম চাইছে না বলেই কি স্কুলটা খুলছে না? না কি এখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, শিক্ষক মশাই বুঝে উঠতে পারছেন না, তিনি কোন পক্ষ নেবেন, তাই খুলছে না স্কুল। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামে গিয়ে উঠলাম।

মনে হল যেন আমাদের কেউ সময় ঘড়িতে হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। এক ভারতীয় শহর থেকে এই গ্রাম ২০ কিমির মধ্যে। ঘরগুলো চিরাচরিত গ্রামের বাড়ি। মাটির। খড়ের ছাউনি। একটা বাঁশের ঝুড়িতে কিছু মাশরুম আর ছোট শুকনো মাছ নজরে এল। কিছু খরগোশ ধরার ফাঁদ এদিকে সেদিকে। এক বয়স্কা মহিলা কাঠের জ্বালে রাঁধছেন কিছু। সব মিলিয়ে একটা সহজ কিন্তু পরিষ্কার গ্রামের বাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন গ্রামের মানুষ, গ্রামের মোড়ল সহ এই বাড়ির দাওয়াতে চলে এল। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। দূরের পাহাড়ের ছায়া গ্রামের দিকে এগোচ্ছে।

কোপা দোভাষির কাজ করছিল। আমি মোড়লকে জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক কী ঘটেছিল এখানে।

— এক দিন জুডুম এল। গ্রামের কিছু লোককে মেরে দিল। আমরা ওদের পুঁতে দিয়ে পালিয়ে গেলাম।

একদম এই রকম। জ্যান্ত, শ্বাস নেওয়া মানুষ মিনিটের মধ্যে মাংসের টুকরোতে পরিণত।

— কত জন মারা গেছিল? কারা ছিল তারা?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে নাম বলতে শুরু করল, আমি কোপাকে আমার ছোট্ট নোটবুকে লিখতে বললাম নামগুলো।

বাধক

চাল্লু

পঞ্চক

এরা সেই মানুষগুলো, যাদের দিনের বেলা টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল। স্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং ঝেঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোনও চিহ্ন রাখা হয় নি। খুব বেশি হলে হয়ত তাদের স্মরণে কিছু পাথর রাখা হয়েছিল কোনও মাঠে। গন্ডীদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো কখনো কখনো বেশ জমকালো হয়। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে এদের জন্য গ্রামবাসীরা ওরকম সাজানোর মতো কিছু পেয়েছিল কিনা।

তালিকা চলছিল। কিন্তু লেখার জন্য আমার কাছে আর কোন কাগজ ছিল না।

— এদের নামে কোনও এফআইআর করা হয়েছে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বৃথা আশা।

মোড়ল আমার দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল। আরে তোমার কি মাথা টাথা খারাপ?

কয়েকদিন আগে স্থানীয় সাংসদ বলিরাম কাশ্যপের বড়ো ছেলে তানসেন কাশ্যপ (২৫) তার গ্রামে মন্দির থেকে পুজো দিয়ে বেরোনোর সময় মাওবাদীদের গুলিতে মারা যায়। তার ভাইয়েরও গুলি লেগেছিল। ভারতীয় মিডিয়া খাড়া হয়ে উঠেছিল এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পরিবেশন করতে। একই রিপোর্ট প্রায় সবকটা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক রিপোর্টেই উল্লেখ ছিল, বলিরাম কাশ্যপ এবং তার পরিবার সালওয়া জুডুমকে খোলাখুলি সমর্থন করত,

— সালওয়া জুডুমের লক্ষ্য বস্তার থেকে মাওবাদীদের তাড়ানো, যেখানে ওই বামপন্থী জঙ্গীরা ১৯৮০র দশকের শেষ থেকে কব্জা রেখেছে।

একথা বলেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট।

মিডিয়া কি এখনও বুঝতে পারছে না? এবছরের প্রথম দিকে সুপ্রিম কোর্ট সালওয়া জুডুমকে বেআইনি আখ্যা দিয়েছে। এমনকী ছত্রিশগড় সরকারের নিজের প্রশাসন বলেছে জুডুম হিংসা এবং বহু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে যুক্ত। যে দৈত্য তারা তৈরি করেছে, এখন তা তাদের হাতের বাইরে। সালওয়া জুডুম যদি আর কিছু করে থাকে, তবে তা হল সে নকশাল আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। যার ফল এখন সবাই টের পাচ্ছে।

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, তানসেন কাশ্যপের খুনীরা সাইকেলে করে পালিয়েছে। দিনে দুপুরে। গ্রামের মধ্যে। গ্রামের রাস্তা খুব পরিষ্কার নয়। কীভাবে সেখান থেকে কেউ পালাতে পারে খুব দ্রুত তা বুঝে ওঠা মুশকিল। এটা সম্ভব কেবল তাদের কেউ তাড়া না করলে। তারা হয়ত হাঁটি হাঁটিও পালিয়ে যেতে পারত।

এটা কেবল একটা খুন নয়। এটা জনসমক্ষে চরম শাস্তি দেওয়া। সবার সামনে, হয়ত সবার হাততালির মধ্যে। তাই যখন হত্যাকারীরা চলে যেতে চায়, তখন তাদের কোনও কসরত করতে হয় না। সালওয়া জুডুম আতঙ্ক তৈরি করেছিল। যদি তুমি তাদের পক্ষে থাকো এবং তোমার সঙ্গে মিলিটারি না থাকে, তাহলে গ্রামে তোমার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। এবার ভাবো, কতগুলি সংবাদপত্র চাল্লুর মৃত্যুর খবর করেছিল? পাঁচ? দুই? এক? যদি বলি কেউ না?

.....

লিঙ্গাগিরি যাওয়ার শেষ পথটুকুতে ছ'টা মিলিটারি চেক পয়েন্ট রয়েছে। ... ছ'নম্বর চেকপোস্টের পর আমরা প্রথম গ্রামটায় গিয়ে উঠলাম। কয়েক কিমি পরপরই এখানে অনেকগুলো গ্রাম রয়েছে। মোড়ল এবং গ্রামবাসীরা এখানে জড়ো হল, আমরা ওখানে যাওয়ার পর। মুন্দেরে যেমন দেখেছিলাম, মেয়েরা, বাচ্চারা এবং পুরুষরা আলাদা আলাদা জটলা করে দাঁড়িয়ে গেল। এখানকার গল্পটাও গতকালের মতোই। মোড়ল হিন্দি বলতে পারে, আমায় বলল,

— নকশালরা আগে থেকেই আসত। ওরা ওদের নাচ করত। মিলিটারি কিছু বলত না।

শেষ চেকপোস্ট আর এই গ্রামের ভেতরের রাস্তাটা একই। একটা নদী আছে চেকপোস্ট আর গ্রামের মাঝখানে। চেকপোস্টে যে সেন্ট্রি বসে আছে সে সহজেই অনেক দূর পর্যন্ত এই রাস্তায় নজর রাখতে পারে। তাহলে কেন নকশালরা অনেকদিন ধরে আসা সত্ত্বেও এবং প্রহরীর চোখের সামনে দিয়ে তাদের নিজস্ব নাচ করা সত্ত্বেও মিলিটারি এতদিন কিছু বলেনি? কেনই বা হঠাৎ কয়েক বছর আগে তাদের এই মত বদল?

মুন্দেরের চেয়ে এখানে অন্তত লোকে একটা বাছাবাছির সুযোগ পেয়েছিল। মোড়ল বলে,

— জুডুম প্রথমে আমাদের গ্রামে এসে বলল, ক্যাম্পে চলো গ্রাম ছেড়ে। আমরা যাইনি।

— কিন্তু হঠাৎ নকশালদের সঙ্গে আছে বলে যখন গাঁয়ের কিছু লোককে মেরে দিল, তখন আর আমরা কিছু ভাবতে পারলাম না। একদিন জুডুমের অনেক লোক এল। ওদের সাথে ছিল পুলিশ, সিআরপিএফ। কিছু লাশ রাস্তায় পড়ে গেল। আমরা তাদের সমাধি দিলাম। তারপর ওই দিনই আমরা সবকিছু নিয়ে গাঁ ছেড়ে ভেগে পড়লাম।

জুডুম গাঁয়ের সব ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল তার পর। খড়ের চালা পোড়ে ভালো, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

— তো আপনারা কোথায় গেলেন?

আমি জিজ্ঞেস করি।

— আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ চলে গেলাম। ওখানে আমাদের কিছু আত্মীয় আছে।

— কী কাজ করতেন ওখানে?

— আমরা মাটি খোঁড়ার কাজ করতাম। কুলির কাজ করতাম। মাসে তিনশ থেকে পাঁচশ টাকা আয় হতো। ওই দিয়েই ভাড়া আর খাবার কিনতে হত, কিছুই বাঁচত না। তাই ভাবলাম, মরে গেলেও গ্রামে ফিরে আসব।

— আর ভিসিএ–র [বনবাসী চেতনা আশ্রম, ওই গ্রামে গ্রামবাসীদের পুনর্বাসনের সহায়তাকারী সংগঠন] কথা কোথা থেকে শুনলেন?"

— আমরা ওনাদের লিখেছিলাম, আমরা গ্রামে ফিরতে চাই। ওরা বলল, আমাদের সহায়তা করবে। তাই আমরা ফিরে এলাম।

— তো এখন গ্রামে থাকতে তো কোনও সমস্যা হচ্ছে না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— হ্যাঁ, এখন চলে এসেছি বটে। কিন্তু আমাদের সব গাইগুলো তো চলে গেছে। তার ওপর এবছর বৃষ্টিও হয়নি, আমরা কিছু করতে পারছি না।

সালওয়া জুডুমে অনেক উপজাতীয় মানুষ আছে। একটা গ্রাম খালি করার পর তারা প্রায়শই গরু–টরু সব মেরে খেয়ে নিত।

এই মানুষেরা পুনর্বাসনের কাজে সহায়তাকারী গোষ্ঠীগুলির রেশনের ওপর বেঁচে আছে। এর মধ্যেও ওরা আমাদের দুটো খেতে দিল। মুড়ি আর নারকেল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল এই হাভাতে মানুষগুলোর কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেতে। কিন্তু গাঁয়ের লোক নিজে না খেয়েও অতিথিকে খাওয়াবে।

এক বাপ–মা মরা মেয়েকেও দেখলাম এখানে। তার বাবা হিংসার শিকার। ... মুন্দেরের অভাগী বাচ্চাদের মতো এও বুঝতে পারছে না, কেন সে এখন সকলের নজরের কেন্দ্রে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা ঠিক করলাম, লিঙ্গাগিরির মূল গ্রামটায় যাব, এখান থেকে দু কিমি দূর। মাঠের মধ্যে রাস্তা আর নেই। এক এক সময় আমি বাইক থেকে নেমে পড়ে জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আর কোপা বাইক নিয়ে ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করছিল।

এই গ্রামের লোকেরা আমাদের দেখে খুব খুশি। ভিসিএ এখানে অনেকটা পুনর্বাসনের কাজ করেছে। গ্রামের কেন্দ্রে রয়েছে একটা বড়ো কুঁড়েঘর, সেখানেই জমা থাকে ভিসিএ–র সরবরাহ করা রেশন এবং অন্যান্য সামগ্রী। গ্রামের লোকেরা দ্রুতই জড়ো হয়ে গেল। লোকে এটাকে ভিসিএ–র মিটিং হিসেবেই ভেবে নিয়েছে। ভিসিএ এবং এএসডিএস এই গ্রামে অনেকগুলি স্বাস্থ্যপ্রকল্প চালু করেছে। চাষিরাই সম্প্রতি চাষিদের শেখাচ্ছে ধান বোনার নতুন পদ্ধতি।

এই গ্রাম আরও ভয়ানক অত্যাচারের সাক্ষী। লিঙ্গাগিরির অন্যান্য গ্রামের মতোই, এদেরও বলা হয়েছিল গ্রাম ছেড়ে ক্যাম্পে যেতে। যখন তারা শুনল না, জুডুমরা মাঝেমধ্যেই এসে এলোপাথাড়ি পেটাতে লাগল, কখনও কখনও চাষের কাজের সময়েও। এক বয়স্কা মহিলা শোনাচ্ছিলেন, কীভাবে তিনি কাঁধে পিঠে বারবার লাঠির বাড়ি খেয়েছেন। তিনি হয়তো এখনও সে মারের চিহ্ন শরীরে বহন করছেন, কিন্তু তিনি লজ্জা পাওয়ায় আমি আর দেখাতে জোর করিনি।

তারপর একদিন জুডুম এল দলে ভারি হয়ে। কয়েকশ জুডুম, পেছনে পুলিশ মিলিটারি নিয়ে এসে কাজ সেরে ঘরের দিকে আসা চারজন গ্রামবাসীর ওপর চড়াও হল। তিনজন পুরুষকে তারা কেটে ফেলল। আর একজন ছিল মহিলা, তাকে ধর্ষণ করে ছুরি বসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল। আমি গতকাল হিমাংশু কুমারের (ভিসিএ–র প্রাণপুরুষ, দান্তেওয়ারায় থাকেন) ঘরে মৃতদেহের ছবি দেখেছি। উনি আমাকে ছবিগুলি দেখিয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন তিনি কী কী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, বা শুরু করার চেষ্টা করেছেন।

ছবিতে শরীরগুলি পচনের বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে। মহিলার শরীরটা পচে গলে পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু তাকে তবুও চেনা যায়। পেটের একটা ক্ষত থেকে তার অন্ত্রটা বেরিয়ে আসছে।

কোনও কেস করা যায়নি। মৃতরা নকশাল, পুলিশ দাবি করে। সংঘর্ষে মারা গেছে। আর প্রমাণ কোথায়? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যদি বা কোনও প্রত্যক্ষদর্শী থেকে থাকে তো সে রয়েছে সালওয়া জুডুম ক্যাম্পে। আমি

ওদের দেওয়া সাক্ষ্যগুলো দেখেছি। প্রতিটা সাক্ষ্য হুবহু এক। এটা নকশালদের কাজ। সালওয়া জুডুম আমাদের বাঁচাতে চেয়েছিল, মৃতেরা নকশাল এবং দোষি। প্রতিটা বয়ান এক, শুধু সাক্ষীর নাম, মৃতের নাম, আর ঘটনার অকুস্থল আলাদা। এবং সাক্ষী যদি গ্রামেই থাকে, এবং কথা বলতে উৎসাহী হয়, তবে তার বয়ান বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ তারা সবাই নকশাল বা নকশালদের সহমর্মী।

তুমি ক্যাম্পে থেকে তো আর জুডুমের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারবে না।

.....

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল [দান্তেওয়ারায়] বনবাসী চেতনা আশ্রমে ফিরতে।

— দেখলেন?

হেসে বললেন হিমাংশুজি। আমি কেবল আমার মাথা নাড়াতে পারলাম। এখনো আমি যা দেখেছি, তা সামলে উঠতে পারি নি। এখানে আশ্রমের দাওয়ায় কয়েকজন বসে আছে। একজন মহিলা, রঙচঙে শাড়ি পড়ে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কয়েকজন। হিমাংশুজি আমাকে তাকে দেখতে বললেন।

— ও গোরকা গ্রাম থেকে এসেছে। ওর কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছিল, ধর্ষণ করতে যাচ্ছিল ওকে ওরা। এক মহিলা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

— বলে যাচ্ছিলেন হিমাংশুজি,

— ও এখন এখানে এসেছে কেস ফাইল করার জন্য।

— এটা কী করে হয়?

আমি বিশ্বাস করছিলাম না।

"আপনি নিজেই ওকে জিজ্ঞেস করুন না।"

হিমাংশুজির অনুরোধে মহিলাটি আমার সামনে চেয়ারে এসে বসলেন। হিমাংশুজি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, মহিলাটি হিন্দি জানেন, তাই আমার আর দোভাষির দরকার হল না। আমি তাঁকে তাঁর গল্প বলতে বললাম।

নাম উমি দেওয়াং। পরিষ্কার গলায় গল্প বলার সুরেলা ভঙ্গীতে, যা গন্ডী ভাষার টানে আছে, সে আমাকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে গেল। ওরা একদিন অনেকে মিলে এসেছিল। সাথে ছিল সিআরপিএফ, মিলিটারি। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা তাকে ঘিরে ফেলল।

— ওরা আমার শাড়ি খুলে নিল। পেটিকোট খুলে নিল।

সে থামল। তারপর বলে চলল,

— আমার ম্যাডাম, যাকে আমি বিশ বছর ধরে চিনি, মাঝখানে এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

কোনও এক বয়স্কা মহিলা, নিজেকে উদ্যত লালসার ভিড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে এই মহিলাকে ধর্ষণ এবং তারপর সম্ভাব্য খুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেও মারা যেতে পারতেন। ভারতের সাহসিকতার পুরস্কার পদ্মশ্রী দেওয়ার জন্য ওই বয়স্কার চেয়ে যোগ্য কারোর কথা আমি আপাতত ভাবতে পারছি না।

— তারপর কেস করা হয়নি? আইন কানুন বলে তো একটা ব্যাপার আছে। এ তো খুব খারাপ!

আমি অসহায়ভাবে কিছু বলার চেষ্টা করলাম।

— কীভাবে কেস করব? মিলিটারি আর পুলিশই তো জুডুমের সাথে ছিল।

— যারা গ্রাম আক্রমণ করল, তাদের কাছে কীভাবে বিচার চাইতে যাবে?

হিমাংশুজি ধরিয়ে দিল।

— কিন্তু আইনের তো কিছু একটা করা উচিত।

আমি যুক্তি খুঁজতে চাইলাম, পেলাম না।

আরও অনেক কিছুই তো হওয়া উচিত। এবং আরো অনেক কিছুই হওয়া উচিত নয়।

যখন ছত্রিশগড় নিয়ে কথা বলেছিল যে কয়েকজন খ্যাতনামা অ্যাকাডেমিক, তাদের একজন নন্দিনী সুন্দর এই গোরকা গ্রামে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন, তাঁর গাড়িটা ভাঙা হয়েছে আক্রমণ করে। ওই গ্রামে যেতে গেলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ২০ কিমি হেঁটে যেতে হয়, গাড়ি রেখে। এটাও তো হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু হয়েছে।

— হ্যাঁ।

হিমাংশুজি হাসলেন,

— আমরা একটা এফআইআর করার চেষ্টা করছি, আমাদের এসপিও–র কাছে যেতে হবে, দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

একদিন আমাদের আশা, আমরা কেসটা রেজিস্টার করতে পারব। আমরা এমনকী নির্দিষ্ট করে করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের সামনে হাজির হওয়ার জন্য বলছি। কেবল আশা, সরকারের লোকেরা মানুক, অবিচার হয়েছে।

এর মধ্যে উমি যদি অভিযোগ না জানিয়ে ফেরত যায়, তাহলে ওর ঝুঁকি বাড়বে। এবার হয়ত ওকে বাঁচানোর জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না ...

অনুবাদকের নোট

১) ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত লিঙ্গাগিরি যাওয়ার পথের প্রথম গ্রামটির নাম বাসাগুড়া। এই বাসাগুড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোকে পালায় ২০০৬ সালে। কীভাবে তারা পালায় তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় তরুণ সাংবাদিক জাভেদ ইকবালের ইন্টারনেট ব্লগে (http://moonchasing.wordpress.com/)।

বাসাগুড়ার একজন গ্রামবাসীর কথায়,

"২০০৫–এর ৫ ডিসেম্বর সালওয়া জুডুম এবং সিআরপিএফ বাসাগুড়ায় এসে একটা পোস্টার মেরে দিয়ে যায়। তাতে লেখা ছিল, সালওয়া জুডুম কাছেই ছোট্ট শহর আভাপল্লীতে ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি একটা মিটিং করবে। তাতে যেসব গ্রামবাসী আসবে না তাদের ধরে নেওয়া হবে নকশাল বলে। আমরা ১ জানুয়ারির মিটিংয়ে যাই। সেখানে বলা হয়, যারা যারা এখানে সংঘম সদস্য (নকশালদের গ্রাম-সংগঠন) আছে, এখানে তারা যদি এক্ষুনি আত্মসমর্পন না করে, তাহলে সবাইকে মেরে ফেলা হবে। ন'জন গ্রামবাসীকে জোর করে সংঘম সদস্য বলে স্বীকার করানো হয় এই মিটিংয়ে। তারপর আমরা মিটিং শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকি, তারপর গ্রামে ফিরি। ২০০৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালওয়া জুডুম বাসাগুড়া গ্রামে এসে আমাদের বলে নকশালদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে এবং যারা রাখবে না, তাদের নকশাল বলে ধরে নেওয়া হবে। দু'দিন পরে বাসাগুড়ার গ্রামবাসীদের জোর করে নিয়ে গিয়ে লিঙ্গাগিরি, বোরেগুড়া, কোরসাগুড়া, সারকেগুড়া, মাল্লেপাল্লি এলাকায় সালওয়া জুডুম মিছিল করে। ওই মিছিল থেকে ওইসব গ্রামে অনেক বাড়ি পোড়ানো হয়। অনেক মানুষকে পেটানো হয়, অনেক মেয়েকে রেপ করা হয়। (ওই গ্রামগুলি ছিল নকশালদের প্রভাবিত।) এর প্রতিশোধ নিতে ২০০৬ সালের ৫ মার্চ রাত্রে বন্দুক হাতে নকশালদের নেতৃত্বে একটি দল বাসাগুড়ায় এসে চারজনকে মেরে দেয়।"...

পরদিন যারা দেহ নিয়ে সেতু পেরিয়ে থানায় গিয়েছিল রিপোর্ট করতে, তাদের ধরে পেটায় সিআরপিএফ এবং সালওয়া জুডুম এবং তাদের ধরে জুডুমের ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেয়, গ্রামে আর ফিরতে দেয়নি। এরপর গ্রামে ঢুকে অত্যাচার চালাতে থাকে সিআরপিএফ এবং সালওয়া জুডুম। লোকে পালাতে থাকে। ২০০৬–এর জুন মাসের মধ্যে বাসাগুডা গ্রাম ফাঁকা হয়ে যায়।

...

লিঙ্গাগিরির যে মূল গ্রামের কথা লেখায় বলা হয়েছে, সেটির নাম বোরেগুডা। ওই গ্রামটিতে সিআরপিএফ, এসপিও এবং জুডুম আক্রমণ করেছিল ২০০৬–এর ডিসেম্বর মাসের ২৫-২৬ তারিখ নাগাদ। ওই গোটা গ্রামটা ছেড়ে সবাই পালিয়ে গিয়েছিল ২০০৬–এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই।

বাসাগুডা থেকে ২ কিমি দূরে দুটি গ্রাম পাকেলা এবং পিসেপাড়া। ওই দুটি গ্রামেই সিআরপিএফ এবং সালওয়া জুডুম অত্যাচার চালিয়েছে, তিনজন খুন হয়েছে গ্রাম ছেড়ে পালানোর সময়। ২০০৬–এর মধ্যে এই দুটি গ্রাম ছেড়ে লোকে পালিয়ে যায়।

...

বাসাগুডা গ্রামেরই মাহারপাড়ায় ২০০৬ সালে নকশালদের হাতে তিনজন খুন হয়। এই মাহারপাড়া গ্রামও ফাঁকা হয়ে যায় ওই বছরেই।

২০০৬ সালের মধ্যেই বাসাগুডা ব্লকের গ্রাম ও পাড়াগুলি : কুমারপাড়া, দোলেগুডা, ধরমপুর, পাঠানপাড়া, নয়াপাড়া --- ফাঁকা হয়ে যায়। একসময় এই বাসাগুডা ছিল একটা বড়ো বাজার এলাকা। পাশের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও এখানে লোক আসত। এখানে থাকত মাহার, তেলগা, মুরিয়া, মুসলিম, হালবাস, দলিত, কুনবি, কলার উপজাতিরাও। ... অনেকেই চলে যায় পাশের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম জেলার চেরলায়।

২) এই ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত অঞ্চলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

এ বছর ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই লিঙ্গাগিরি যাওয়ার রাস্তাটি পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। অজুহাত, ওই অঞ্চলটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পুনর্স্থাপিত গ্রামগুলিতে বাইরে থেকে সাহায্য করার প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেছে। নভেম্বরের শেষ দিকে বনবাসী চেতনা আশ্রমকে বলা হয়েছে ওই এলাকায় সমস্ত রকমের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে, কারণ ওখানে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' চলছে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' বলে কিছু হচ্ছে কি না তিনি জানেন না। কিন্তু ছত্রিশগড় সরকারের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকের এক সংস্থার দেওয়া ওই নোটিশে স্পষ্টভাবে ওই কথাক'টির উল্লেখ আছে। ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখকের সঙ্গী বনবাসী কল্যাণের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত সমাজকর্মী কোপা কুঞ্জমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, পুনম হোঙ্গা নামে একজনকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে। বস্তুত, কোপা আহত পুনম হোঙ্গাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। পুলিশ হেফাজতে কোপাকে বেধড়ক মারা হয়, বলা হয় বনবাসী চেতনা আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে। এখনও কোপা জেলে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বনবাসী চেতনা আশ্রমের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সালওয়া জুডুম। ১৪ ডিসেম্বর থেকে আশ্রমের প্রাণপুরুষ হিমাংশু কুমারকে ঘিরে থাকছে সাত আটজন পুলিশ, সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাকে পুলিশ এসকর্ট দেওয়া হয়েছে।

চিঠিপত্র

বিষয় : সমস্যা সমাধানে 'মন্থন'

বছর দুয়েক ধরে আমরা মন্থন সাময়িকীর পাঠকবন্ধু। মার্চ–এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যায় একটি চিঠির বিষয় ছিল, 'সমস্যা সমাধানে মন্থন' এবং এ প্রসঙ্গে পূর্বে প্রকাশিত দুটি চিঠিতে যে প্রশ্ন বা বিষয়ে আলো ফেলা হয়েছে, আমাদের মনে হয় তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেড়শ বছরের পুরনো বামপন্থার বিপুল কর্মকাণ্ডকে আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়ে নতুন করে হিসেব–নিকেশ করা জরুরি। যারা সমাজমঙ্গলের কথা ভাবছে, তাদের এই বিচারধারায় যুক্ত হতে হবে। এছাড়া সামনে এগোনোর আর কোন পথ নেই। তাই আমি মার্চ–এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যার পত্রলেখক রঘু জানার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি, "আমাদের চাই কথোপকথনের সংস্কৃতি। চাই খোলামেলা মেশার একটা মেজাজ, পরস্পরের মধ্যে আপন চিন্তাভাবনা বোধের নিয়ত আদানপ্রদান। আমার কাছে 'মন্থন সাময়িকী' পত্রিকাটির প্রয়োজন এখানেই। আমরা যদি মন্থনকে তথাকথিত অগ্রণী, তাত্ত্বিক ভূমিকায় দেখব আশা করি, মোহাবিষ্ট হই, তবে মন্থনের মৃত্যুঘন্টা আমাদের হাতে বাজবে না তো?"

আমরা আরও খোলসা করে বলতে চাই, খোলামেলা কতটা আর কথোপকথনের সীমানাটা কোথায়? এখনও পর্যন্ত আমাদের রেওয়াজ বা অভ্যাস বামপন্থী সীমানাটাকে অতিক্রম করেনি। এই বামপন্থায় থেকেছে অনেকগুলো প্রতিপাদ্য, ব্যানার ও শ্লোগানসর্বস্বতা, স্থির নিশ্চয়তার রাজত্ব ও দুর্গ। মুক্তি মানে সমস্যা–বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ–সমাধানের হাইওয়ে। মুক্তি মানে মার্ক্সের তত্ত্ব–রাজত্ব, লেনিন–রুশ বিপ্লব, মাও সেতুঙ–চীন বিপ্লব–ভিয়েতনাম বিপ্লব–কমিউনিস্ট পার্টি, সাচ্চা নেতৃত্ব, সাচ্চা পথ। এই পরম্পরার মধ্যে থাকার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, এর ব্যর্থতার ভয়ঙ্কর রূপগুলো দেখবার চোখ বা মন থাকে না। রুশ বিপ্লবের পরে লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান তিনটি কর্মকাণ্ড ছিল : মিলিটারি স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; বিরোধী চিন্তাগুলিকে জবরদস্তি দমন, মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন; জার আমলের বিশাল উপনিবেশগুলিকে আরও নিবিড়ভাবে পুনর্দখল ও সম্প্রসারণ। ষাটের দশক থেকে আমরা দেখলাম, 'সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন' হয়ে উঠল উপনিবেশ ও স্বৈরতন্ত্র–বিরোধী অজস্র সংগ্রামের রণক্ষেত্র। ১৯৮৯ সালে রুশ সাম্রাজ্য প্রায় ভেঙেই পড়ল। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ায় কি খুব একটা আলাদা কিছু হয়েছে? তিব্বত, পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর বা চীনা নাম জিনজিয়াং) ইত্যাদি ১৯৪৬–এর আগেকার স্বাধীন দেশগুলোর মানুষের অবস্থান থেকে দেখলে মহান চীন বিপ্লব কেমন দেখা যায়? অনেকে বলেন, লেনিন–মাও–হো চি মিনরা ক্ষমতালোভী, স্বৈরতান্ত্রিক ছিলেন, যাঁরা শোষণমুক্তি ও সমাজমঙ্গলের ব্যানারটাকে ঢাল ও তরোয়াল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আমরা কিন্তু মনে করি, সমাজমঙ্গল ও শোষণমুক্তির তাড়নাই তাঁদের পরিচালিত করেছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্ষমতার ভাইরাস তাঁদের আদর্শবাদী অনুপ্রেরণাগুলোর মধ্যে ঢুকে তাকে বিকৃত করেছিল। এই ভাইরাস কাউকেই

ছাড়ে না। আমাকেও নয়। অনেকে বলেন, তারা মার্ক্সের তত্ত্ব বোঝেনি বলে প্রোগকে বিকৃত করেছিল। আমি উত্তর আমেরিকার আদিবাসী কর্মী ও তাত্ত্বিক অয়ার্ড চার্চিলের ভাষাতে বলব, "মার্ক্সের তত্ত্বের মজ্জায় রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের ইন্ডাস্ট্রিয়াল উন্নয়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং যুক্তিবাদ। এর সঙ্গে আদিবাসীদের মুক্তির চিন্তা একেবারে খাপ খায় না।" আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্ষমতার ভাইরাস কি মার্ক্সকে ছেড়ে দিয়েছিল?

আমাদের প্রশ্ন, ১৯১৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বামপন্থী ধারার মধ্যে আমরা যারা থেকেছি, তারা এই মুক্তিসংগ্রামগুলোকে কতটা স্বীকৃতি দিয়েছি ও সমর্থন জানিয়েছি? সারা বিশ্বের বামপন্থী বিপ্লব সবথেকে বেশি এশিয়াতেই ঘটেছে এবং সমস্ত বিপ্লবই চূড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক ও শোষণভিত্তিক পুঞ্জিভবন প্রক্রিয়া (accumulation process)–র জন্ম দিয়েছে। চীন আজকে বিশ্বপুঁজির প্রোডাকশন লাইন। কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক বর্শামুখ। আমরা ষাটের দশকে বামপন্থী কর্মীরা দু–দুটো প্রজন্মকে এই স্বপ্নভঙ্গের আগুনে নিঃশেষ হতে দেখেছি। একদিকে আমাদের মহান পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্ধবিশ্বাস; অন্যদিকে বহু মানুষ বলছে, পিতাটি মাফিয়া ডন। এই প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে আমরা চোখবুজে পক্ষাঘাতের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। তাই আমরা এই মর্মান্তিক অবস্থাকে বামপন্থার সঙ্কট আর বলতে চাইছি না। আমরা বলব, সব ধরনের শোষণ, হায়ারার্কির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী ধারাগুলির ওপরে বামপন্থা এক বিশাল সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। বামপন্থা স্বয়ং একটা সঙ্কট হিসেবে দেখা দিয়েছে।

"ছোটোবেলা থেকে আমাদের মতো ঘরে প্রায় সব গুরুজনদের কাছে আশির্বাদ পেয়ে থাকি 'বড়ো হও', 'প্রতিষ্ঠিত হও'।" রঘু জানার এই মন্তব্যের সাথে আমরা আরও বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে একথা ভাবতে চাই, আমাদের সকলের মনের মধ্যে সমাজমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা যেমন থাকে, তেমনই থাকে অন্যের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, অনুরাষ্ট্র তৈরি করা এবং তার সম্প্রসারণে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা। আমাদের সামাজিক পরম্পরাগুলির মধ্যে, আমাদের কৃষ্টি ও স্বভাবে, আমাদের মনের গভীরে এই সব ধরনের ধারার অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে থাকা এবং একে অন্যকে প্রভাবিত করার রহস্যময় ক্রিয়াকাণ্ড কেন্দ্রীয় একটি বিষয়। ভালো কাজ করতে গেলে ভালো হয় যেমন, তেমন অনেকসময় খারাপও হয়। এটা শুধুমাত্র মার্ক্সবাদীকাজের মধ্যে সীমিত নয়। এটা আমরা জাতীয়তাবাদী, গান্ধীবাদী, জয়প্রকাশ নারায়ণবাদী, সমস্ত বড়ো ধারার মধ্যে দেখেছি। আবার ছোটো ছোটো ক্লাব বা লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রভৃতি সংগঠিত প্রয়াসের মধ্যেও দেখি। কিন্তু এই খারাপ কাজগুলি কীভাবে কতটা হয়, কীভাবে এদের ক্ষমতাদূষণকে কম করা যায়, এটা নিয়ে আলোচনা কতটুকু হয়েছে বা হয়? প্রশ্নাকারে বলা যায়, এই আলোচনা করার ধারণাগত সাধন (conceptual tools) বা ভাষার নির্মাণ কতটুকু এগিয়েছে?

এগোনো, আছাড় খাওয়া, ভেঙে পড়া — এই দুষ্টচক্র থেকে আদানপ্রদান (sharing) ছাড়া কীভাবে বেরোনো সম্ভব? এশিয়াতে এটা আজকের জ্বলন্ত প্রশ্ন। আবার সেই কথাটাতেই ফিরে আসি। খোলামনে অন্যের কথা শুনতে হবে। শোষণমুক্তিকামী বামপন্থার কথা অবশ্যই আমরা শুনব। কিন্তু তার বাইরের কথাও শুনতে শিখতে হবে। শুনতে হবে সমস্ত ধরনের সমাজ ও ব্যক্তিমঙ্গলের কথা। শুনতে হবে তাদের কথা, যারা ওইধরনের তত্ত্বের ভাষায় কথা বলে না। শুনতে হবে সাধারণ মানুষের বহু রঙের কথা, জীবনের কথা। শুনতে হবে তাদের কথা, যারা উন্নয়ন–উৎপাদন–এগিয়ে যাওয়া–ওপরে ওঠার দৌড়ে আসতেই চায় না; যারা তলানিতে থাকে। শুনতে হবে তাদের কথা, যারা নানাধরনের সক্ষমদের ক্ষমতার জোটে চাপা পড়ে থাকে। শুনতে হবে সমস্ত বন্য ও মুক্ত পশুপাখি ও গাছপালাদের কথা। শুনতে হবে এই গ্রহের সমস্ত প্রাণী–প্রজাতিদের কথা, যাদের আমাদের স্বার্থে লাগে না বলে, যাদের বশ করা যায় না বলে আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি। এরা সবাই আমাদের মনের মধ্যেও আছে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯

আমরিন (ডিম্পল) ও যোগীন
সোদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা

তপনের সংসার

অনুলিখন : তমাল ভৌমিক

এই বয়ান যাঁর, নাম তাঁর তপন হালদার। ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন, দেউলিয়া স্টেশনে নেমে দশ মিনিটের রাস্তায় কানপুর গ্রাম, পোস্ট অফিস , থানা উস্তি, ডায়মন্ডহারবার। তপন পুরনো কাগজ কিনতে আসেন আমাদের বাড়িতে। তাঁর বাকি কথা তাঁর মতো করেই আমার লেখায় রাখার চেষ্টা করলাম।

ও ঘটনা ভুলবার নয়। কিরকিরে মাছ দাদা বাজার থেকে কিনে এনছিল। কিরকিরে মাছ জানো? অ্যামন আঙুল দে তারে টিপে দিলে পেট ফুলিয়ে গোল করে ট্যাপা মতন হয়ে যায়। বাবা গেছল উস্থিতে কংগ্রেস পার্টির জিলা সম্মেলনে রান্না করতে। সন কত জানি না — বামফ্রন্ট আসার আগে। আমার বয়স তখন দশ, দাদার আঠারো বছর। এখন আমার বয়স ধরো চল্লিশ–পঁয়তাল্লিশ হবে।

ঝে কথা বলছিলাম। মা আর আমরা তিন ভাই মাছ রান্না করে খেয়েচি। দাদা ঘরে শুয়ে। আমি দেখি দাঁড়াতে পারচি না। জিভটা কে ঝেন ভিতর দিকে টেনে নিচ্চে। কত জল খাচ্চি, গলার ভেতরটা তাও শুকনো লাগচে। চোখে আঁধার। দাওয়ায় বসে মা আর দু ভাই ঢুলচি। পাশের ঘর থে কাকা আর কাকী এসে চারটে ভ্যানে আমাদের শুইয়ে নিয়ে গেল দেউলি স্টেশনে — ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে নে যাবে। দ্যাখে তার কাটা। ট্রেন বন্ধ। ভ্যান ছুটল উস্থিতে। দাদার তখন সাড় নেই। আমি সব শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখে সব ঘোলা ঘোলা দেখচি। ওখানে পাশ করা ডাক্তার গোলাম রসুল, নাম জানো? তখন খুব বড়ো ডাক্তার ছিল। তিনি দেখে বলল, দাদা মারা গেছে। আমাদের বাঁচাতে হলি হাসপাতালে নে যেতে হবে। বাবাকে সম্মেলনে খবর দেওয়া হল। ওখানে এমএলএ সুধেন্দু মণ্ডল এসে বলল, 'কী হয়েছে রে?' বাবা কেঁদে পড়ল। সব শুনে বলল, 'কার গাড়িতে তেল আছে দ্যাখ্'। এমুন কপাল দ্যাখো, কংগ্রেস সম্মেলনে অত গাড়ি, কারু গাড়িতে বেশি তেল নেই! শেষে একটা সাদা গাড়ির ড্রাইভার দু' জানলায় লাল কাপড় উড়িয়ে কোনরকমে নিয়ে গেল ডায়মন্ড হাসপাতালে। সেখানে সাতদিন সেলাইন চলল। মা আর দু'ভাই বেঁচে ফিরলাম। দাদা চলে গেল।

দাদা চলে গেল। বাবার শরীর ভাঙল। নিজেদের কোন জমি নেই। চোদ্দশতক বাস্তু ভাগাভাগি হয়ে পৌনে শতক আমরা পেয়েছি। সেখানে একটা মাথা গোঁজার মতো ঝুপড়ি। বাবা, স্বর্গীয় কালীপদ হালদার, আগে

চাষের কাজ করতেন। বড়ো ভাই মারা যাওয়ার পর আর পারেন না। আমি তখন ওই কাকীর সাথে খুদের কারবারে লাগলাম। দু'ক্লাস অব্দি পড়েছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি। লিখতেও পারি না, পড়তেও পারি না। শুধু নিজের নামটা সই করতে পারি। তো কাকীর সাথে চলে যেতাম হাইড রোডে — মেটালবক্স কোম্পানির পাশে জিঞ্জিরাবাজার, ওইদিকে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে খুদ কিনতাম। সব বাড়িতে চাল চেলে খুদ রাখত মা–দিদিরা। তাই কিনতাম কাকীর সাথে গিয়ে। প্রথমে দিনে এক কিলো লাভ থাকত। তাই ঘরে এনে চারজনে একবেলা খেয়ে কোনরকমে কাটাতাম।

আস্তে আস্তে লাভ হতে লাগল। খুদ কিনতাম জিঞ্জিরাবাজার এলাকায়। বিক্রি করতাম দেশে। আমাদের মতন যারা গরিব–দুঃখী, তারা কিনত। তা প্রায় দশ–বারো বছর এই খুদের ব্যবসা আমি করেছি। দু'পয়সা জমিয়েছি। তখন বাবা আমার বিয়ে দিল। আমার শ্বশুরমশায়ের পাড়ার মধ্যে সবচে বেশি বাস্তুজায়গা ছিল — বিঘে খানেক। বাবা তার কাছ থেকে দু'কাঠা চেয়ে তার মেয়েটার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করল। তিনি এক কাঠা দিয়েছিলেন। সেখানে মাটি ঢেলে রেখেছি। ভগবানের কৃপা হলে ঘর করব কোনদিন।

আমি খুদ–ব্যবসা ছেড়ে পুরনো কাগজ–শিশি বোতলের ব্যবসা ধরার পাঁচ বছর বাদে মার স্ট্রোক হল। বাবা তার আগেই মারা গেছে। পাঁচ বছরে ব্যাঙ্কে প্রায় কুড়ি–বাইশ হাজার টাকা জমিয়েছিলাম। মার পিছনে সব টাকা খরচ হল। মা আর উঠল না। জানেন তো দাদা, আমার দু'ছেলে এক মেয়ে। আপনাদের আশির্বাদে মেয়েটার বিয়ে দিতে পেরেছি। বড়ো ছেলেটা গ্রাজুয়েট হয়েছে। পড়াশুনায় ভালো। কোনও ক্লাসে ফেল করেনি। ছোটোটাও এখন গ্রাজুয়েট হয়েছে। কাজ কেউই পায়নি। বড়োটা কিছুদিন পিয়ারলেস হাসপাতালের কাছে একটা ওষুধ কোম্পানিতে কন্ট্রাক্টে কাজ করত। মাইনে ছিল মাসে ৩৬০০ টাকা, পেত ১৮০০ টাকা। বাকি টাকাটা যে ওকে কাজে লাগিয়েছিল সে নিত। দু'বছরের মাথায় সে বলল, 'মহাদেব তোকে আর কাজ করতে হবে না। তোর দু'বছর হয়ে গেছে। এখন কোম্পানি তোকে নিয়ে নেবে। তাহলে আমার আর টাকা হবে না।' মহাদেব বলল, 'দাদা, বাবা–মাকে লুকিয়ে বিয়ে করেছি। এখন বৌ নিয়ে যাব কোথা, খাব কী? কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন।' সে বলল, 'কিছু শুনতে চাই না। তুমি চলে যাও।' কী বলব দাদা! ঝামেলা করা যায়। কিন্তু কোন লাভ নেই। ওরা লোকাল লোক। ছেলেকে বোঝালাম, 'সবই ভগবানের ইচ্ছে। তুমি চাকরির পরীক্ষা দাও।' ছেলে এখন প্রাইমারি টিচারের পরীক্ষা দিচ্ছে।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজ বিক্রির লাইনে তেমন লাভ নেই। এদিকে ঘাড়ে ছেলে, ছেলের বৌ। কাউকে ফেলতে পারবনি। কাগজ বিক্রি বছরে তিনমাস চলে — ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক আর বছরে দু'বার পরীক্ষার পর বড়ো জোর আরও দু'তিনমাস। তাতে মাসে তিন থেকে চার হাজারের বেশি হয় না। বর্ষার সময়টা অন্যের জমি নিয়ে চাষ করতে হয়। সবাই মিলে করি — আমি, বৌ আর ছেলেরা। এবারে দু'বিঘে জমি নিয়েছিলাম চৌত্রিশশ' টাকায়। ট্রাক্টর–সার–ওষুধ নিয়ে দু'বিঘেতে আট হাজার টাকা খরচ। একসঙ্গে সবটা খরচ হয়নি। আর বৃষ্টির জলে চাষ, জলের খরচ লাগছে না। ধান হবে চব্বিশ বস্তা। পাঁচশ টাকায় এক বস্তা বিক্রি করলে পাব বারো হাজার টাকা। বিক্রি করে লাভ কী? এক বস্তার ষাট কিলো ধান থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলো চাল হয় — বাজারে সে চাল কিনতে নয়শ টাকা লাগে।

ওই ধান আমরা বিক্রি করি না, খাই। মাস আষ্টেকের খোরাকি হয়ে যায় চব্বিশ বস্তায়। পাঁচ কাউন খড় পাব, সেটাই লাভ — জ্বালিয়ে ধান সিদ্ধ করব, বিক্রি করব, একটা গরু আছে, খাবে। আমাদের ওখানে জমি উঁচু, জলের অভাব, খোরো চাষ হয় না। পয়সাও নেই যে চাষের জল কিনব। দেখি বড়োটার যদি একটা চাকরি–টাকরি হয়। আচ্ছা দাদা, প্রাইমারি টিচারে খুব কম্পিটিশান না? হাজার হাজার ছেলে নাকি পরীক্ষা দেবে শুনছি? আমাদের পাড়ায় একজন বলেছে, ভিতর থেকে দেখবে যাতে ছেলেটার হয়। লাল পার্টির লোক না, অন্য পার্টির। দেখি কী হয়?

মন্থন সাময়িকী পাওয়া যাচ্ছে

কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটের পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি এবং বইচিত্রে; শিয়ালদহ স্টেশনের নর্থ প্ল্যাটফর্মে সেল্‌ফশাইন বুকস্টলে, হাওড়া স্টেশনে সুবীর মুখার্জির স্টলে, উল্টোডাঙায় সোনির শোরুমের সামনে, ডালহৌসিতে হঙকঙ ব্যাঙ্কের গায়ে অজিত পোদ্দার ও কোলে বুকস্টলে, তারাতলায় এলআইসি অফিসের পাশে রাজু বুকস্টলে, বেহালা ট্রামডিপোয় পান্না সুইট্‌সের বিপরীতে তেওয়ারি বুকস্টলে, রাসবিহারিতে প্রগ্রেসিভ বুকস্টলে, নুঙ্গি মোড়ে পিপল্‌স লাইব্রেরিতে (সুমিত রতন কর), যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডের পিছনে জ্ঞানের আলোয়; কোননগর ও সোনারপুর রেল স্টেশনে, আসানসোলে পোস্ট অফিসের কাছে বার্নওয়াল বুক স্টলে

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হন

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬টি দ্বিমাসিক সংখ্যার গ্রাহক–চাঁদা ৫০ টাকা
মানিঅর্ডার/ডাকযোগে টাকা পাঠানো এবং চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা
জিতেন নন্দী
বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ১৮
দূরভাষ ২৪৯১৩৬৬৬
ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com

এবং প্রতি মঙ্গলবার যোগাযোগ
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯–এ দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

ভ্রম সংশোধন

পত্রিকার সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের ‘গড়ে ওঠার পাঠ’ রচনাটির এক বড়ো অংশ বাদ গেছে। ফলে এটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আমরা এই ভুলের জন্য দুঃখিত। আগামী কোন সংখ্যায় সম্পূর্ণ লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা–২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলিকাতা–৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
Website : http://manthansamayiki.googlepages.com, E-mail : manthansamayiki@gmail.com, Telephone No. 2491-3666